ভগবৎ-দর্শন

৪১ বর্ষ ▪ ১১শ সংখ্যা ▪ মাধব ৫৩১ ▪ জানুয়ারী ২০১৮

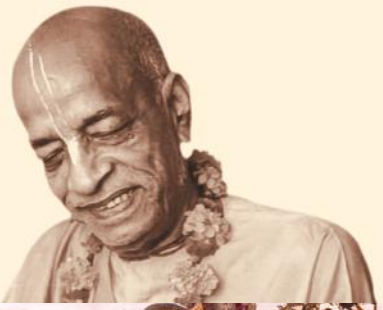

বিষয়-সূচী

প্রবন্ধ

নিতাই পদকমল	২
ভগবান নিত্যানন্দের করুণা	৫
শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী	১০
প্রকৃত গুরু চিহ্নিতকরণ	১৪
দুর্ভাগ্য সহনের স্তর	১৯
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভের সহজ উপায়	২৫
একচক্রার পুণ্যতীর্থে নিত্যানন্দ রায়	২৭
শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের বাংলাদেশ পরিদর্শন	৩০

বিভাগ

প্রশ্ন উত্তর	৯
ছোটদের আসর	১৭
অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ	১৮
ইসকন সমাচার	২২
ভক্তি কবিতা (মর্ত্যের মানবে দেখো)	২৯

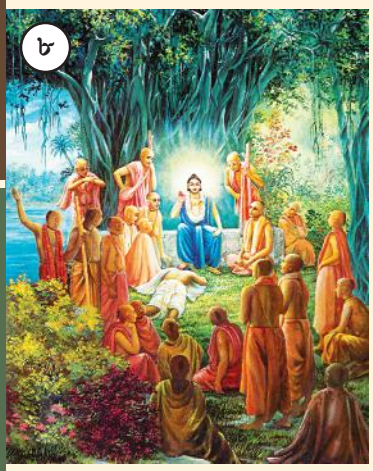

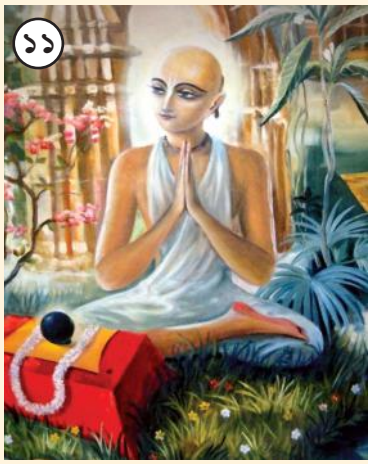

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারক ছিলেন তাঁর মুখ্য পার্ষদ শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু। নিত্যানন্দ হলেন ভগবান শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ প্রকাশ। অন্য অর্থে, তিনি শ্রীচৈতন্যদেব থেকে অভিন্ন। এই একই পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতের পতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হন। এই কীর্তনে, তাই, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শরণাগত হলে কি কি লাভ পাওয়া যায় তা বর্ণনা করেছে।

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর একজন পরম ভক্ত এবং ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব থেকে গুরু পরম্পরা ধারার একজন আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। তিনি বহু গীত রচনা করেছেন, যেগুলি কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তদের দ্বারা স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি এই সমস্ত গীতসকল সাধারণ বাংলা ভাষাতেই গেয়েছিলেন কিন্তু এই সকল গীতের অন্তর্নিহিত অর্থ এবং তাৎপর্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাই এই সমস্ত গীতগুলির মধ্যে অনেক গীত ইংরেজী ভাষাতে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন।

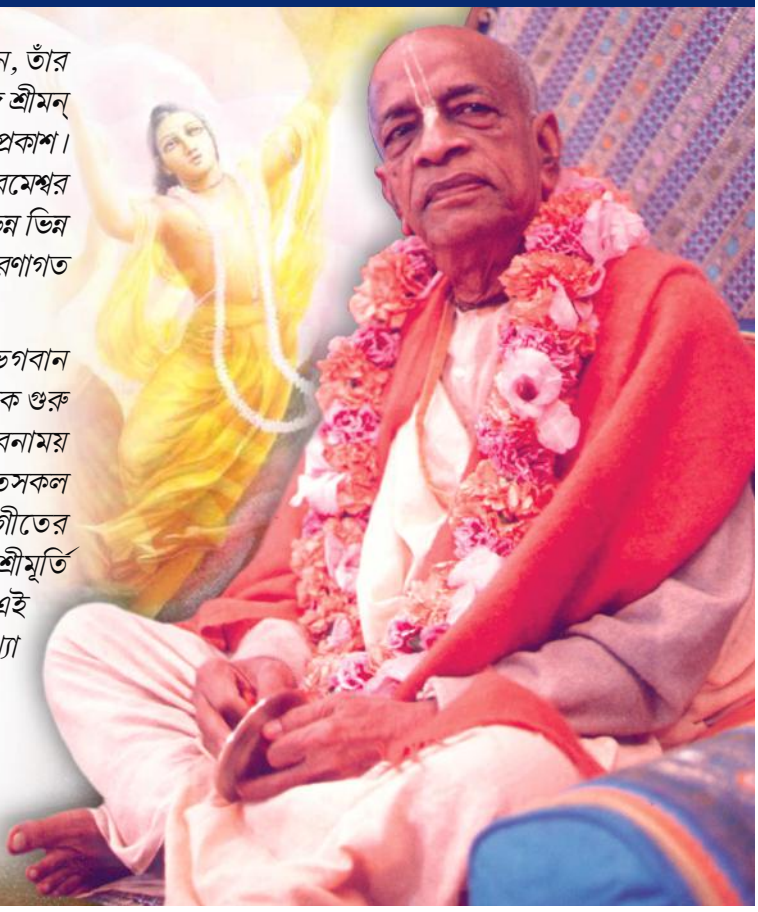

নিতাই-পদকমল কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।।
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার।।
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইয়ের করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি।।
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ।।

এটি একটি অনুপম গীত যা শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছিলেন। তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন যে, নিতাই-পদ, অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দের চরণকমল এমন এক আশ্রয় যেখানে একজন চন্দ্রের জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা পাবে যা শুধুমাত্র একটি চন্দ্র নয়, কোটি চন্দ্র সম। আমরা শুধুমাত্র কোটি চন্দ্রের জ্যোৎস্নার একত্রীভূত স্নিগ্ধ রূপকে কল্পনা করতে পারি। এই

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর

জড় পৃথিবীতে (জগত) যা নরকের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যেখানে সর্বদাই জ্বলন্ত অগ্নি প্রজ্বলিত এবং যেখানে সকলেই শান্তিহীন কঠোর পরিশ্রম করছে; সুতরাং, যদি কেউ এই জগতে প্রকৃত শান্তি চায় তাহলে তাকে শ্রীনিত্যানন্দের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে যা কোটি চন্দ্রের সুশীতল জ্যোৎস্নালোকের ন্যায় স্নিগ্ধ। জুড়ায় অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে। যদি কেউ প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বের লড়াই থেকে মুক্তি চায় এবং

নিতাই-পদ, অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দের চরণকমল এমন এক আশ্রয় যেখানে একজন চন্দ্রের জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা পাবে যা শুধুমাত্র একটি চন্দ্র নয়, কোটি চন্দ্র সম।

সত্য সত্যই প্রবল জড় যন্ত্রণার অগ্নিকে নির্বাপিত করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে নরোত্তম দাস ঠাকুরের উপদেশ হলো, 'দয়া করে শ্রীনিত্যানন্দের শরণাগত হও।'

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণকমলে আশ্রয়ের ফল কি হবে? তিনি বলেছেন, হেন নিতাই বিনে ভাই ঃ

যতক্ষণ না একজন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করছে, রাধা-কৃষ্ণ পাইতে নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত তার রাধা-কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি পথে অগ্রসর হওয়া অতি কঠিন। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে রাধা-কৃষ্ণ ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, যদি কেউ প্রকৃতপক্ষে রাধাকৃষ্ণের লীলানৃত্যে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

তারপর তিনি বলেছেন, সে সম্বন্ধ নাহি, সম্বন্ধ অর্থাৎ 'সংযোগ' অথবা 'যোগ'। কোন ব্যক্তি যে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেনি — জানতে হবে, তার মনুষ্য জন্ম বৃথা। অন্য একটি গীতে শ্রীল নরোত্তম দাস এও বলেছেন, হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু। কোন ব্যক্তি যদি শ্রীনিত্যানন্দ সম্পর্ক ব্যতীত রাধাকৃষ্ণ প্রেমভক্তি পথে অগ্রসর হয়, তাহলে সে নিরর্থক ভাবেই তার জীবন নষ্ট করবে। সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার। যদি কেউ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে, তা সে অবশ্যই মনুষ্য-জন্ম পাওয়ার আশির্বাদকে বিনষ্ট করবে। সেই পশু বড় দুরাচার। সে অসদাচারী অর্থাৎ 'অতি অভদ্র'। শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দের কৃপার মাধ্যমে জীবনকে কৃষ্ণভাবনামৃতে উন্নীত না করার অর্থ হচ্ছে জীবনকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পাশবিক প্রবৃত্তিতে ধ্বংস করা। নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন যে, সাধারণ পশুকে

গৃহপালিত বা বশীভূত করা যায় কিন্তু যদি কোন মানুষ শুধুমাত্র পাশবিক প্রবৃত্তির হয় সে অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং তাকে বশীভূত করা যায় না। সাধারণ বিড়াল-কুকুর এমন কি বাঘকেও বশীভূত করা যায়। কিন্তু যখন কোন মানুষ তার সাধারণ বৃত্তির বাইরে যায় এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের মানবিক প্রয়াসকে অবহেলা করে, তখন তার উচ্চতর চেতনা পাশবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থের জন্য অপব্যবহৃত হয় এবং তাকে তখন বশীভূত করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র আইন প্রয়োগের দ্বারা একজন চোরকে সৎ মানুষ বানাতে পারে না। কারণ তার হৃদয় কলুষিত, সে কোনভাবেই বশীভূত হবে না। প্রত্যেক মানুষ দেখে যে, একজন অপরাধী তার অপরাধের জন্য সরকার দ্বারা দন্ড প্রাপ্ত হয় এবং শাস্ত্রীয় বিধানেও অপরাধীর জন্য নরক বাস নির্ধারিত আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শাস্ত্রীয় বিধান শোনার পর এবং সরকার প্রদত্ত দন্ড দেখেও আসুরিক প্রবৃত্তি বশীভূত হতে পারে না।

তারা কি করছে? নিতাই না বলিল মুখে। যেহেতু তারা জানেনা নিত্যানন্দ কে, তারা কখনো শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীচৈতন্যের নাম উচ্চারণ করেনি। মজিল সংসার সুখে। তারা তথাকথিত জড়জাগতিক আনন্দে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তারা কে চৈতন্য, কে নিত্যানন্দ এসবে মনোযোগ দেয় না এবং কেবল তারা জড় অস্তিত্বের গভীরে চলে যায়। বিদ্যা কুলে কি করিবে তার — যদি কারও শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে সংযোগ না থাকে এবং সে যদি কৃষ্ণভাবনামৃতে না আসে, তবে তার বিদ্যা অর্থাৎ তার তথাকথিত বিদ্যালয় শিক্ষা এবং

কুলে, অর্থাৎ উচ্চজাতি বা উচ্চবর্ণে জন্মও তাকে সুরক্ষা প্রদান করতে পারবে না। কোন ব্যক্তি উচ্চ বংশে অথবা উচ্চজাতিতে জন্মগ্রহণ করেছে অথবা তার অতি আধুনিক বিদ্যা শিক্ষা আছে কিন্তু মৃত্যুর অমোঘ নিয়ম তার কাজ করবেই। সেই ব্যক্তির সকল কর্ম ধ্বংস হবে এবং তার কৃতকর্ম অনুযায়ী সে পুনরায় দেহ প্রাপ্ত হবে।

কেন মানুষ এইভাবে কার্য করে? অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া। তারা দেহাত্মবোধের মিথ্যা অহংকারে পাগল হয়ে যায় এবং তাই তারা শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ ভুলে যায়। অসত্যরে সত্য করি মানি ঃ এই বিস্মৃতিশীল মানুষগুলি মায়া শক্তিকে সত্য বলে গ্রহণ করে। অসত্যেরে, অর্থাৎ যা প্রকৃত নয় অথবা অন্য অর্থে বলা যায় মায়া। মায়া অস্থায়ী মরীচিকা মাত্র। যাদের শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে যোগ নেই তারা এই মায়াশক্তিকে প্রকৃত বলে গ্রহণ করে।

নরোত্তম দাস ঠাকুর তারপর বললেন, নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পা'বে — 'যদি কেউ প্রকৃতপক্ষে রাধা-কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই প্রথমে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা পেতে হবে। যখন তিনি কারোর প্রতি করুণাশীল হবেন তখনই সে রাধা-কৃষ্ণের সঙ্গ লাভে সমর্থ হবে।' ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি। নরোত্তম দাস ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রত্যেককে দৃঢ়ভাবে শ্রীনিত্যানন্দের চরণকমল ধরতে।

তারপর পুনরায় বলেছেন, নিতাইয়ের চরণ সত্য। কারোর এটা ভুল বোঝা বা চিন্তা করা উচিত নয় যে, যেহেতু সে মায়া দ্বারা আবদ্ধ, সেহেতু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণকমলও মায়া। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর পুষ্টি করেছেন, নিতাইয়ের-চরণ সত্য — শ্রীমন নিত্যানন্দের শ্রীচরণ কমল মায়া নয়; তা প্রকৃত সত্য। তাহার সেবক নিত্য এবং যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমময় চিন্ময় সেবায় নিযুক্ত সেও চিন্ময়। যদি কেউ কৃষ্ণভাবনামৃতে শ্রীনিত্যানন্দের প্রেমময় সেবায় নিযুক্ত থাকে সে তৎক্ষণাৎ আধ্যাত্মিক স্তরে পারমার্থিক স্থিতি প্রাপ্ত হয় যা চিন্ময় এবং পরম সুখ প্রদানকারী। সুতরাং তিনি উপদেশ দিচ্ছেন, নিতাই-পদ সদা কর আশ — সর্বদাই শ্রীনিত্যানন্দের চরণকমল ধরার চেষ্টা কর।

নরোত্তম বড় দুঃখী — নরোত্তম দাস ঠাকুর, যিনি একজন আচার্য, তিনি ভাবছেন যে, তিনি বড়ই অসুখী। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি বলছেন, 'হে আমার প্রিয় পরমেশ্বর, আমি খুব দুঃখী। নিতাই মোরে কর সুখী, তাই আমি ভগবান নিত্যানন্দের কাছে প্রার্থনা করছি আমাকে সুখী করার জন্য। রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ। অনুগ্রহ করে আমাকে তোমার শ্রীচরণকমলের এক কোণে স্থান দাও।'

ভগবান নিত্যানন্দের করুণা

শ্রীমৎ গিরিরাজ স্বামী মহারাজ

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার।।

যেহেতু তিনি প্রেমানন্দে মগ্ন এবং করুণার প্রতিমূর্তি, তিনি ভালো এবং মন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না।

যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার।।

যেই তাঁর শরণাগত হয়েছে তাদের সকলকেই তিনি মুক্তি প্রদান করেছেন। সেইজন্য তিনি আমার মতো পতিত পাপীকেও উদ্ধার করেছেন।

প্রেমে অর্থ 'প্রেমানন্দে', শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল রূপ গোস্বামীকে অনুসরণ করে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ভক্তির বিভিন্ন স্তর আছে এবং সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হলো প্রেম। প্রেম-ভক্তি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেম। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হলেন বলরামের অবতার, যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রথম স্বরূপ প্রকাশ, এবং সেইজন্য আমরা বলতে পারি যে, নিত্যানন্দ প্রভু হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বরূপ প্রকাশ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো নিত্যানন্দ প্রভুও প্রেমানন্দ অনুভব করেন এবং এই প্রেমানন্দে মগ্ন থাকেন।

কৃপা-অবতার। তিনি করুণার অবতার। অবতার শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো 'যিনি অবতরণ করেন।'

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গেই 'চিন্ময়লোক' থেকে প্রকৃতপক্ষে করুণা বিতরণের জন্য অবতরণ করেছিলেন। এই কার্যে তিনি ভালো এবং মন্দ (উত্তম-অধম) উচ্চ-নীচ বিচার করেননি। যে-ই তাঁর শরণাগত হয়েছে তাকেই তিনি উদ্ধার করেছেন। তিনি আমার মতো পতিত এবং পাপী দুরাচারীকেও উদ্ধার করেছেন।

অন্য অর্থে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর করুণা প্রাপ্তিতে দুরাচার কোন অযোগ্যতা নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত যোগ্যতা রয়েছে। এই যোগ্যতা হলো আগে তাঁর শরণাগত হতে হবে। অন্য অর্থে বিনয়াবনত হতে হবে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হলেন ভগবানের প্রথম স্বরূপ প্রকাশ। তাই তিনি হলেন প্রকৃত আধ্যাত্মিক গুরু। তিনি ভগবানের প্রথম দাস এবং ভগবান ব্যতীত ভগবৎজ্ঞানের তিনিই প্রথম শিক্ষক। আধ্যাত্মিক গুরুর কর্তব্য হলো ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত হওয়া এবং ভগবৎ জ্ঞান প্রদান করা। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উভয় কার্যই করেছেন। আগে পড়য়ে তারে, তাঁর সম্মুখে অবনত হওয়া — আধ্যাত্মিক গুরুর সম্মুখে অবনত হওয়া, আধ্যাত্মিক গুরুর শরণাগত হওয়া — এই হলো একজন শিষ্যের প্রথম যোগ্যতা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নির্দেশ প্রদান করে; তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। প্রথমে, প্রণিপাত; তোমাকে আধ্যাত্মিক গুরুর সম্মুখে অবনত হয়ে শরণাগত হতে হবে। সুতরাং যিনি নিত্যানন্দ প্রভুর সম্মুখে অবনত হয়েছেন, তিনি দুরাচারী (পাপী ও পতিত) হলেও উদ্ধার হবেন।

দুই প্রভু গৌর-নিতাই হরিনাম সংকীর্তন সঙ্গে করে এই কলিযুগে অবতরণ করেছেন পতিত জীবাত্মাদের উদ্ধার করতে।

কিভাবে তারা উদ্ধার হবেন? সেটি নরোত্তম দাস ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন;

ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই শচী-সুত হইল সেই
বলরাম হইল নিতাই।
দীন-হীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই।।

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, তিনিই শচীনন্দন (ভগবান শ্রীচৈতন্য) এবং বলরাম হলেন নিত্যানন্দ, হরিনামে সকল নীচ এবং অধম আত্মা উদ্ধার হলো। জগাই এবং মাধাই নামের দুই পাপী এর সাক্ষী।' (প্রার্থনা)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তনের মাধ্যমে অধম পতিত জীবাত্মাদের উদ্ধার করতে। অন্য অর্থে, তাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবাত্মাকে উদ্ধার করেছিলেন। ভক্তিযোগ অভ্যাসের মাধ্যমে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম জপ-কীর্তনের মাধ্যমে পতিত জীবাত্মাদের অন্তরে ধীরে ধীরে কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয় (গোলোকের প্রেমধন হরিনাম-সংকীর্তন)।

একদা বম্বেতে একজন ভারতীয় ভদ্রলোক শ্রীল প্রভুপাদের কাছে এসে তার কৃপা ভিক্ষা করেন, 'স্বামীজি, স্বামীজি, আপনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারেন। দয়া করে কৃপা করুন। দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন।' শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দিলেন, 'আমি আপনাকে রক্ষা করতে পারি না। আপনাকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমি আপনাকে সেই প্রক্রিয়া দিতে পারি যার দ্বারা আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন।' সুতরাং দুই প্রভু গৌর-নিতাই হরিনাম সংকীর্তন সঙ্গে করে এই কলিযুগে অবতরণ করেছেন পতিত জীবাত্মাদের উদ্ধার করতে। তাঁরা মুক্ত হস্তে এই নাম বিতরণ করেছেন। আমাদের তা গ্রহণ করতে হবে।

ভগবান করুণা দান করেন, কিন্তু আমাদেরও তা গ্রহণ করতে হবে। গ্রহণ করার যোগ্যতা হলো প্রকৃত বিনম্রতা। এর অর্থই হলো প্রণিপাত। যদি তুমি বিনয়ী হও, তুমি অবনত হবেই, তুমি শরণাগত হবে। এই রূপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্মুখে অবনত হতে হবে — শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সকল দাসের সম্মুখে অবনত হতে হবে, নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধিদের সম্মুখে অবনত হতে হবে। আধ্যাত্মিক গুরুর সম্মুখে অবনত হতে হবে। কৃষ্ণভাবনামৃতে ভাবিত হওয়ার এই একমাত্র পথ — যিনি অহংকারী তিনি কখনোই অবনত হবেন না। যিনি বিনয়ী একমাত্র তিনিই অবনত হবেন।

কলিযুগে সংকীর্তনই হলো ধর্ম, এবং কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন; কৃষ্ণের শক্তি ব্যতিরেকে কেউ কখনোই সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করতে পারে না। ইতিহাসে শ্রীল প্রভুপাদের মতো এই রূপে কেউই সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করেননি। তিনি সমগ্র পৃথিবীতে এই সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করেছেন যা পূর্বে কেউ করেনি। এর অর্থ এই যে, তিনি কৃষ্ণশক্তিতে শক্তিমান ছিলেন। আমরা যদি আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হব। যেমন শ্রীল প্রভুপাদের এক গুরুভ্রাতা প্রভুপাদের সম্মুখে বলেছিলেন যে, তিনি অধম, পতিত, দুরাচারীদের উদ্ধার

কল্পে বিশেষ রূপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বলে বলীয়ান ছিলেন এবং তা করেছিলেন। যেমন আমরা পড়েছি তিনি যথার্থই সেই রূপ ছিলেন। যে শ্লোকগুলি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বর্ণনা করেছে সেগুলি শ্রীল প্রভুপাদের বর্ণনাতেও বলা যায়; তিনি প্রেমানন্দে মগ্ন করুণার অবতার যিনি উত্তম এবং অধম বিচার করেন না। তিনি কোন পার্থক্য না করেই কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রতি শরণাগত প্রত্যেককেই তিনি উদ্ধার করেছেন। অবশ্যই শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার ইতিহাস দীর্ঘকাল চর্চা করলেও অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। আমি সাহস করে বলতে পারি যে, ভগবান অনন্ত, তাঁর অসীম মস্তক এবং জিহ্বা দিয়ে অসীম কাল ব্যাপী বললেও শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি শুধু একটি ছোট্ট ঘটনা বর্ণনা করছি। প্রথম দিকে শ্রীল প্রভুপাদের লোয়ার ইষ্ট সাইডের একজন ভক্ত যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন ভারতে এই আন্দোলন নতুন ছিল। কোলকাতা এবং বম্বেতে আমাদের কেন্দ্র থাকলেও দিল্লীতে একটি ছোট ভাড়া বাড়ী ছিল। কোলকাতা মন্দিরের অধ্যক্ষ বম্বেতে ফোন করেছিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের সচিবকে অবগত করিয়েছিলেন যে, সেই নবীন ভক্তটি কোলকাতায় আছেন এবং গাঁজা (মারিজুয়ানা) সেবন করছেন, এবং জিজ্ঞাসা করলেন এই অবস্থায় তার কি করণীয়। শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দিলেন, 'ঐ ভক্তকে বল যে, যদি সে গাঁজা বন্ধ না করে তাহলে আমি তাকে ত্যাগ করব।' এই ফোনালাপের পরে তমালকৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেন, 'সত্যিই কি আপনি তাকে ত্যাগ করবেন?' শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, 'না। আমি কাউকে ত্যাগ করতে পারি না।' তখন তমালকৃষ্ণ গোস্বামী বলেন, 'কিন্তু এখানে একটা সীমা থাকা কি উচিত নয়? আপনার কি কোন জায়গায় সীমারেখা টানা প্রয়োজন?' শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দিলেন, 'ভগবান শ্রীনিত্যানন্দের করুণার কোন সীমা নেই।'

লস এ্যাঞ্জেলেসে এক বক্তৃতায় শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, 'রাধাকৃষ্ণের প্রতি অগ্রসর হতে . . .।' ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে, একজন ভক্তের এটিই সর্বোচ্চ গন্তব্য। রাধা এবং কৃষ্ণের প্রতি অগ্রসর হওয়া। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, 'রাধা

এবং কৃষ্ণের প্রতি অগ্রসর হতে গেলে ভগবান শ্রীচৈতন্যের কৃপা প্রয়োজন। ভগবান শ্রীচৈতন্যের কৃপা পেতে হলে ভগবান নিত্যানন্দের করুণা প্রয়োজন। ভগবান নিত্যানন্দের করুণা পেতে গেলে তোমাকে জগাই এবং মাধাইয়ের মতো লোকের কাছে যেতে হবে।' (হাসি) সুতরাং আমাদের নিম্নস্তর থেকে শুরু করে উচ্চস্তরে পৌঁছাতে হবে। সেটিই হলো শ্রীচৈতন্য এবং বিশেষরূপে শ্রীনিত্যানন্দের করুণার সর্বোত্তম স্তর।

ভগবান নিত্যানন্দের করুণা যে পাবে সে শ্রীচৈতন্যের কৃপা প্রাপ্ত হবে এবং ভগবান শ্রীচৈতন্যের কৃপার মাধ্যমে ভক্তিযোগের অমূল্য সম্পদ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম, ব্রজভক্তি লাভ করবে। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আমাদের এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষের দ্বারা এটি সম্ভবপর হচ্ছে। সেইজন্য আমরা তাঁর কাছে চিরঋণী।

নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা করছেন, হা হা প্রভু নিত্যানন্দ, প্রেমানন্দ সুখী / কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী, 'হে পরম প্রিয় নিত্যানন্দ প্রভু, আপনি সদা সুখী।' হা হা প্রভু নিত্যানন্দ, প্রেমানন্দ সুখী ঃ 'কৃষ্ণ প্রেমের আনন্দে আপনি সর্বদাই সুখী এবং আমি অত্যন্ত দুঃখী। দয়া করে আমার প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টিপাত করে আমাকেও সুখী করুন।' এটি একটি স্বার্থপর অভিলাষ বলে মনে হতে পারে। আমরা বলি যে, শুদ্ধ ভক্তদের কোন স্বার্থযুক্ত অভিলাষ থাকে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করেই একমাত্র আমরা সুখী হতে পারি।

সুতরাং ভগবান নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা অবলোকনের দ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম জপ-কীর্তন করতে পারি এবং সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার ও প্রসার করতে পারি। গুরু পরম্পরা ধারার মাধ্যমে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে পারি। তাহলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই সুখী হব। ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু তা-ই চান। সেটাই শ্রীল প্রভুপাদও চেয়েছেন ঃ সকলে সুখী হোক। তাঁর নীতি ঃ 'জপ করুন এবং সুখী হউন।'

শ্রীমৎ গিরিরাজ স্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের একজন সন্ন্যাসী শিষ্য এবং ইসকন গভর্নিং বডির কমিশনার। তিনি নিয়মিত রূপে সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগী, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তির সাথে যুক্ত বিভিন্ন পেশাদারদের এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্গদর্শন প্রদান করেন।

আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

প্রশ্ন ১। মধুময় হরিনাম জপ করতেও ভালো লাগে না, আগ্রহও নেই। এরকম কেন হয়? *— দীপঙ্কর মাজী, বর্ধমান।*

উত্তর ঃ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীশ্রীহরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থে বলেছেন,

কনক-কামিনী আর জয়-পরাজয়।
প্রতিষ্ঠাশা, শাঠ্যবৃত্তি তাহার নিলয়।।
এসব আকৃষ্টি হৃদে হইলে উদয়।
নামেতে অনবধান স্বভাবতঃ হয়।।

যখন ধন-সম্পদ আহরণের চিন্তা, কামিনী সঙ্গের ইচ্ছা, জয়-পরাজয় চিন্তা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা পাওয়ার বাসনা, লোকের ক্ষতি করার মনোবৃত্তি — এইগুলি হৃদয়ে নিবিষ্ট থাকে, তখন হরিনামে স্বাভাবিকভাবেই অনবধান বা উদাসীনতা জনিত অপরাধ হয়ে থাকে।

ক্রমে ক্রমে সেই সব চিন্তা পরিহারে।
যতিবে সৌভাগ্যবান বৈষ্ণব আচারে।।

ক্রমে ক্রমে সেই সব চিন্তা পরিত্যাগ করে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তি আচরণে যত্ন করবেন।

প্রশ্ন ২। সবাই যদি ভক্ত সাধু হয়ে যায়, তা হলে এই জগতের অবস্থা কিরূপ হবে? *— সন্তোষ প্রামানিক, রায়গঞ্জ।*

উত্তর ঃ সবাই সাধু হয়ে গেলে এই জগৎ বৈকুণ্ঠের মতো রূপ ধারণ করবে। সবার মধ্যে সৌহার্দ, প্রীতি, সম্মান, সহযোগিতা প্রকাশিত হবে। কপটতা, হিংসা, কুটিনাটি, প্রতারণা, কালোবাজারি, লাম্পট্য, দস্যুভাব, মহামারী, যুদ্ধ, দাঙ্গা, খাদ্যে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, ছেলে পাচার, মেয়ে পাচার, পশু পাচার, খুনখারাপি থাকবে না। লোকে শান্তি ও আনন্দে জীবনযাপন করতে পারবে।

সবাইকে ভক্ত হওয়ার জন্য মহাপ্রভুর প্রচারকার্য সংগঠন। অভক্ত হচ্ছে নাস্তিক। সে সৃষ্টিকর্তাকে মানে না, সৃষ্টিকে খামখেয়ালীপনা মনে করে। সমগ্র জগতকে তার ভোগের জায়গা রূপে কল্পনা করে। সে অন্যের জীবনের মূল্য মর্যাদা দিতে চায় না। সে নিজেকেই মহান বলে জাহির করে। অন্যের উপর আধিপত্য করতে চায়। অন্যের উদ্বেগকর বিষয় উদ্ভাবন করাই তার জীবনের লক্ষ্য। এই রকম অসাধু অভক্ত এই জগতে থাকলে জগৎজীবের আয়ু কমে যাবে, দেহে মনে দুর্বল হয়ে পড়বে, ব্যাধিগ্রস্ত হবে। কখনও স্বস্তি পাবে না।

অনেকে মনে করে সবাই ভক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে চলে গেলে এই জগৎ ফাঁকা পড়ে থাকবে। সেটি ভুল কথা। সব ছাত্র পরীক্ষায় পাশ হয়ে স্কুল থেকে চলে গেলেও সেই স্কুলে আবার অনেক ছাত্র এসে ভর্তি হয়। তেমনই সবাই ভক্ত হয়ে চিন্ময় জগতে চলে গেলে অন্য জীবকুল মানুষ-দেহ ধারণ করে এসে এখানে বসবাস করবে। একটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আশি লক্ষ প্রজাতির ইতর প্রাণী বাস করে, তারা মানুষদেহ ধারণ করবে। ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র জীবসমূহ ভক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে চলে গেলে কোটি কোটি অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড থেকে সূক্ষ্ম জীব এসে এই ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ করবে।

যদি মনে করেন, ভক্ত থাকুক, অভক্তও থাকুক। সাধু অসাধু উভয়ে থাকলে জগৎটা ভালো চলবে। এই কথার অর্থ হলো, আমার যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় তর্পণ করার সব রকম সুবিধা থাকুক, আর কেবল অন্যদের জন্য নিয়ম শৃঙ্খলা পালনের বাধ্যবাধকতা থাকুক।

কথাটি ভাবুন, 'ধূমপান নিষিদ্ধ' এই কথাটি কাদের জন্য? যারা ধূমপান করে না তাদের জন্য, না কি যারা ধূমপান করে, তাদের জন্য? যদি কোন ধূমপায়ী এসে বলে, ধূমপান যদি কেউ না করে তাহলে জগতের কি দশা হবে? জগতে কেউ যদি অসাধু না থাকে তাহলে কি হবে? এ এক কিম্ভূত প্রশ্ন।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

তামিলনাড়ু রাজ্যের তিরুচিরাপল্লী জেলায় প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান শ্রীরঙ্গম। এখানে ভারতের সবচেয়ে বৃহৎ মন্দির শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির। শেষ শয্যায় শায়িত শ্যামবর্ণ শ্রীনারায়ণই শ্রীরঙ্গনাথ। দিন-রাত লক্ষ লক্ষ দর্শকের সমাগম হয়। ব্রাহ্মণদের দ্বারা উচ্চারিত মন্ত্রধ্বনিতে মন্দিরটি সর্বদা মুখরিত। ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত পর্যটন কালে এখানে এসে 'হরে কৃষ্ণ' নাম কীর্তন করতে থাকলে উপস্থিত লোকজন

স্তম্ভিত ও বিস্মিত হন। মহাপ্রভুর অঙ্গকান্তি দর্শন করে সকলে বিমুগ্ধ হন। মহাপ্রভুর শ্রীমুখ থেকে মধুময় হরেকৃষ্ণ কীর্তন শুনে সকলে পুলকিত হন। ব্রাহ্মণরা মহাপ্রভুর নয়নকমল থেকে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা দর্শন করে অবাক হলেন। সবাই ভাবতে লাগলেন, এ রকম ব্যাপার তো কোনও মানুষের মধ্যে দেখা যায় না! এ বা কোন্ দেবতা এলেন? সোনার মতো উজ্জ্বল অঙ্গ মাটিতে লুটাচ্ছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন স্থির থাকতে না পেরে মহাপ্রভুর কীর্তন নৃত্যে যাতে কেউ বিঘ্ন না করে সেজন্য লোকদেরকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। তারপর যখন তিনি দেখলেন ঐ দিব্য পুরুষটি একটু স্থির হয়েছেন, তখনই তিনি তাঁর শ্রীচরণের ধূলি মাথায় নিলেন। সেই ব্রাহ্মণটি হলেন শ্রী ব্যেঙ্কট ভট্ট। তিনি মহাপ্রভুকে সাদর আমন্ত্রণ করে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন। মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধৌত করে সেই চরণজল সপরিবারে পান করলেন। ভট্টের গৃহ আনন্দময় হয়ে উঠল। ব্যেঙ্কট ভট্ট, ত্রিমল্ল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁরা তিনজন সহোদর ভাই। শ্রী প্রবোধানন্দ সরস্বতী ছিলেন শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ী ত্রিদণ্ডী

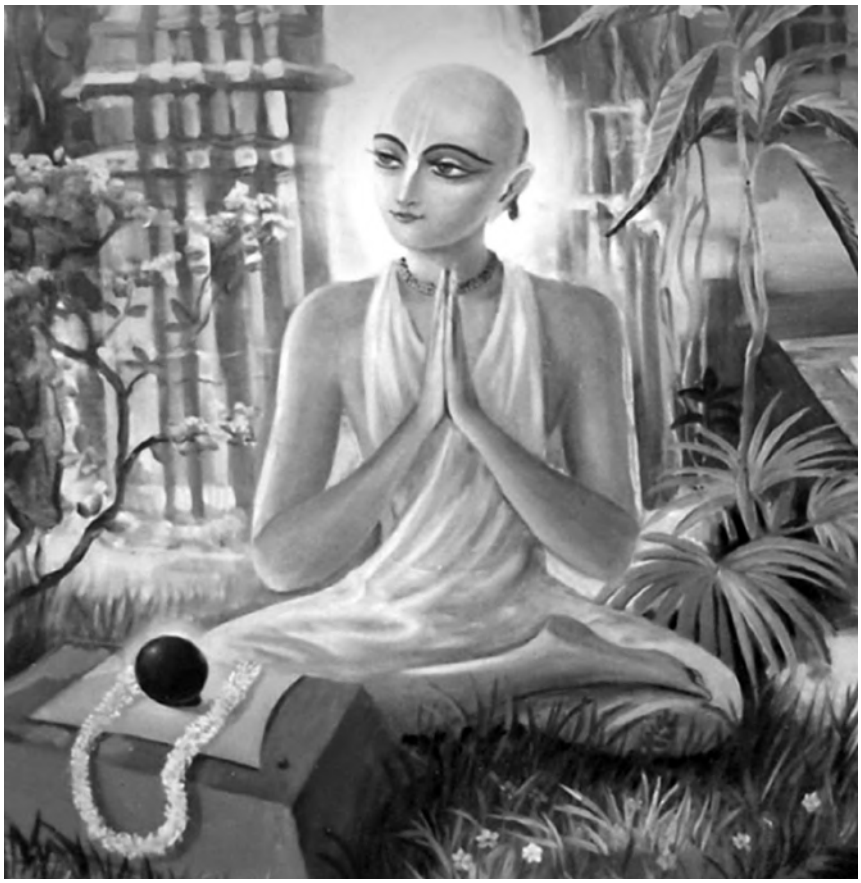

সন্ন্যাসী। শ্রী ব্যেঙ্কট ভট্ট ও ত্রিমল্ল ভট্টও রামানুজীয় বৈষ্ণব। ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট তখন সাত-আট বছরের বালক। সে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণাম করতে গেলে মহাপ্রভু তাকে কোলে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। ভোজন শেষে মহাপ্রভু অবশেষ গোপালকে দেন। গোপাল ভট্ট মহাপ্রভুর চরণ মর্দন করতেন, তাঁকে জল এনে দিতেন। মহাপ্রভু তাঁদের ঘরে চাতুর্মাস্যের প্রায় চারমাস অবস্থান করে নিয়ত কৃষ্ণকথা কীর্তন করতেন।

লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক ব্যেঙ্কট ভট্টকে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার লক্ষ্মীদেবী সাধ্বী শিরোমণি। আমার কৃষ্ণ গো-চারণকারী রাখাল। লক্ষ্মীদেবী তাঁর সঙ্গ চান কেন?

ব্যেঙ্কট ভট্ট বললেন, কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই স্বরূপ। কৃষ্ণের স্পর্শে তাই লক্ষ্মীদেবীর পতিব্রতা ধর্ম ক্ষুন্ন হয় না।

মহাপ্রভু বললেন, লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করেও কৃষ্ণকে পেলেন না। অথচ শ্রুতিগণ তপস্যা করে কৃষ্ণকে পেলেন কেন?

ভট্ট বললেন, আমি তা বুঝি না, আপনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলে মনে করি। আপনি যদি জানান তবে জানতে পারি।

মহাপ্রভু বললেন, কৃষ্ণ নিত্য গোপরাজনন্দন। নিজেকে সর্বদা গোপ অভিমান করেন। গোপী ছাড়া অন্য কাউকেও তিনি স্পর্শ করেন না। লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠের ঈশ্বরী। তিনি কখনও গোপীদের আনুগত্য স্বীকার করেন না। শ্রুতিগণ গোপীর আনুগত্যের জন্য তপস্যা করে গোপগৃহে গোপকন্যারূপে জন্মাবার পর শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন। আপনার লক্ষ্মীদেবী তাই কৃষ্ণকে পেতে চাইলেও পাচ্ছিলেন না। কিন্তু গোপীরা কুঞ্জে কুঞ্জে যখন কৃষ্ণকে খুঁজে বেড়ালেন তখন স্বয়ং কৃষ্ণ নারায়ণরূপে দাঁড়িয়ে থাকলেন। গোপীরা সেই চতুর্ভুজ নারায়ণ দেখে প্রণতি জানিয়ে প্রার্থনা করলেন, হে নারায়ণ, কৃপা করে নন্দনন্দনকে পাইয়ে দাও। সেখান থেকে তাঁরা চলে গেলেন, কেউই নারায়ণের প্রতি আকৃষ্ট হলেন না। রাধারাণী এসে যেই তাঁকে দেখলেন, তিনি আর নারায়ণরূপ রাখতে পারলেন না। নিজ স্বরূপে প্রকাশিত হলেন। তখন অন্যান্য গোপীরা সেখানে দৌড়ে এলেন। লক্ষ্মী কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হলেও গোপীরা আপনার নারায়ণের প্রতি আকৃষ্ট নন।

ভট্ট পরিবারের সবাই এই সব কথা শুনে আনন্দসাগরে ভাসতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে চারমাস কেটে গেল। মহাপ্রভু বিদায় চাইলেন। ভট্টগৃহে সবাই কাঁদতে লাগল। গোপাল ভট্ট তো দুঃখিত মনে মহাপ্রভুর চরণতলে পড়ে মূর্চ্ছা গেলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন — এই ব্যাপারটা তাঁরা কেউই সহ্য করতে পারছিলেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন আরও কয়েকদিন তাঁদের গৃহে থাকলেন। তারপর একদিন মহাপ্রভু গোপাল ভট্টকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি এখন ঘরে মা-বাবার সেবা করো। তারপর বৃন্দাবনে এসো। ভট্ট-পরিবারের সবাইকে নির্দেশ দিলেন, আপনারা সবাই নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ-কীর্তন করুন। কৃষ্ণ আপনাদের কৃপা করবেন। বহু প্রবোধ দিয়ে মহাপ্রভু অন্যত্র যাত্রা করলেন।

গোপাল ভট্ট অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী হলেন। তাঁর কাকা প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিশেষ করে তাঁকে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন।

গোপাল ভট্টের মন সর্বদা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চিন্তায় মগ্ন থাকত। দিন-রাত চিন্তা করতেন, কবে আমি মহাপ্রভুর দর্শন পাব। এদিকে বৃদ্ধ মা-বাবাকে ছেড়ে কোথাও যাওয়া ঠিক নয়। তাই তিনি পিতা-মাতার সেবা করতে লাগলেন। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল।

পিতা-মাতা জানতেন, আমাদের পুত্র অন্য ছেলেদের মতো নয়। তার মধ্যে রয়েছে পরম বৈরাগ্য ভাব। কিন্তু তার হৃদয় স্নেহময় ও মনোরম। সে একজন কবি, সে গীত করে, বাজনা বাজায়, নৃত্যও করে। সে তার কাকা প্রবোধানন্দের কাছে ভক্তি শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছে। সে সুশিক্ষিত। সে কত মনোযোগ দিয়ে, কত সুন্দর করে আমাদের সেবা-যত্নে রয়েছে। কিন্তু তার মনপ্রাণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুলিত। কোনও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে ব্যেঙ্কট ভট্ট ও তাঁর সহধর্মিনীর কাছে তাঁদের পুত্র গোপালের মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন এবং তাঁদের সবার অত্যন্ত প্রশংসা করতে লাগলেন।

একদিন গোপালের মাতা-পিতা জীবনের অন্তিম দিনগুলিতে গোপালকে কাছে ডেকে বলতে লাগলেন, বাবা, আমাদেরও হৃদয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য কাঁদছে। আমরা আর থাকতে পারছি না। বাবা তোমাকে দেখেই আমরা ধন্য হয়েছি। আমরা চলে গেলে তুমি অবশ্যই বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর কাছে যাও।

মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করতে করতে গোপালের মা-বাবা পরলোক গমন করলেন। তারপর গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে এসে রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর কাছে পৌঁছলেন। রূপ গোস্বামী তাঁকে ভাইয়ের মতো অনেক আদর-যত্ন করতে লাগলেন। তখন মহাপ্রভু নীলাচলপুরীতে ছিলেন। রূপ গোস্বামীর পত্র দ্বারা গোপাল ভট্টের বৃন্দাবনে আসার কথা শুনে তিনি গোপাল ভট্টের জন্য কাপড় পাঠিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর কৃপা দেখে সানন্দে সেই কৌপীন বহির্বাসাদি ধারণ করলেন। রূপ, সনাতন গোস্বামীদের মতো গোপাল ভট্টও কুঞ্জে কুঞ্জে রাত কাটাতেন। ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন ও লিখন কাজ করতেন।

একসময় হরিনাম করতে করতে গেলেন সাহারানপুর নামক স্থানে। বৃন্দাবনে ফিরে আসার সময় ঘটনাচক্রে গণ্ডকী নদীতে স্নান করলেন। স্নান করতে গিয়ে বারোটি শালগ্রাম শিলা পেয়েছিলেন। একটা ঝোলায় করে শালগ্রাম বয়ে নিয়ে যেতেন। যেখানে থাকতেন সেখানে রাখতেন। দ্বাদশ শালগ্রামের সেবা করতেন।

বৃন্দাবনে একদিন এক ধনী ব্যবসায়ী গোপাল ভট্ট গোস্বামীর দর্শনে আসেন। সেই ধনী শেঠজী আনন্দিত চিত্তে শ্রীভগবানের সেবার জন্য বহু উপকরণ এনে ভট্টগোস্বামীকে দিলেন। উপকরণের মধ্যে বস্ত্র অলঙ্কারও ছিল। গোপাল ভট্ট গোস্বামী সেই সমস্ত দ্রব্য শালগ্রামের সামনে রেখে দিলেন। শেঠজী তাঁর কাছ থেকে প্রীত মনে বিদায় নিলেন। ভট্ট গোস্বামী সন্ধ্যাবেলায় শালগ্রামের আরতি, ভোগ অর্পণ ইত্যাদি করে শালগ্রামকে শয়ন দিলেন। উপরে একখানি বড় ঝুড়ি চাপা দিলেন। তারপর রাত্রে কিছুক্ষণ হরিনাম জপ করলেন। সামান্য প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম নিলেন। সেই সময় ভাবতে লাগলেন, আমার যদি একটি সুন্দর বিগ্রহ থাকতো তা হলে আমি এসব কাপড় ও গয়না দিয়ে তাঁকে সাজাতে পারতাম।

ভোরের বেলায় যমুনা স্নান করে এসে শালগ্রাম জাগরণ করতে গেলে, ঝুড়ি তুলে দেখলেন, শালগ্রামগুলির মধ্যে একটি শালগ্রাম দিব্য বংশীধারণ করে ত্রিভঙ্গরূপে অবস্থান করছেন। গোপাল ভট্ট গোস্বামী সেই অপূর্ব শ্রীমূর্তি দর্শন করে আনন্দসাগরে ভাসতে লাগলেন। অন্যান্য গোস্বামীরাও মহানন্দে সেখানে এলেন। রূপ গোস্বামীরা সেই শালগ্রাম থেকে স্বয়ং প্রকাশিত বিগ্রহের নাম রাখলেন শ্রীরাধারমণদেব। সেই দিনটি ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা (মে, ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দ)।

শ্রীরাধারমণদেবের প্রকট মহোৎসব উদ্‌যাপিত হলো বহু ভক্তসমাগমে।

মোঘলদের উৎপাতের ফলে বৃন্দাবনের প্রায় মূল বিগ্রহসমূহ জয়পুরে স্থানান্তরিত হলেও গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রাধারমণ বৃন্দাবনেই বিরাজমান।

হরিদ্বারের কাছে সাহারানপুরে দেববন্দ্য গ্রামে একসময় গোপাল ভট্ট গোস্বামী এক ভক্তগৃহে যাচ্ছিলেন। বিকালে হঠাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টি হলো। পথে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিলেন। ব্রাহ্মণের কোনও পুত্র ছিল না। গোপাল ভট্ট গোস্বামী তাঁকে হরিভক্তিপরায়ণ পুত্র লাভের আশীর্বাদ করলেন। ব্রাহ্মণ তখন অদ্ভুত কথা বললেন, আমার পুত্র হলে আপনার সেবার জন্য দেব।

তার দশ বছর পরে একদিন দুপুরে যমুনা স্নান করে গোপাল ভট্ট গোস্বামী ভজনকুটিরে ফিরছেন, দূর থেকে দেখলেন, একটি শিশু তাঁর কুটির দ্বারে বসে আছে। গোস্বামীকে কাছে আসতে দেখে শিশুটি দন্ডবৎ প্রণাম জানালো। তার পরিচয় দিয়ে বলল, আমার নাম গোপীনাথ, আমার বাবা আপনার সেবা করার জন্য আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তখন গোপাল ভট্ট গোস্বামীর সেই দশ বছর আগের কথা স্মরণ হলো। বালকটিকে কাছে রাখলেন। বালক গোপীনাথ অতি সাবধানে ভট্ট গোস্বামীর সেবা করতে লাগল। গোপীনাথ আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। রাধারমণের সেবা করতেন। পরবর্তীতে তাঁর ছোটভাই দামোদর তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে সপরিবারে রাধারমণের সেবা করতে থাকেন।

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীরাধারমণের সেবা করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা স্মরণে বিহ্বল হতেন। দু'নয়নে তাঁর অশ্রুধারা ঝরত। তখন শ্রীরাধারমণদেব শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে ভট্টগোস্বামীকে দর্শন দিতেন। (ভক্তিরত্নাকর - ৪/৩৪৫)

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্যকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করেন। ষট্ সন্দর্ভের কারিকা, কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা, সৎক্রিয়াসার দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় কবি কর্ণপুর লিখছেন —

অনঙ্গমঞ্জরী সাদ্য গোপাল ভট্টকঃ।
ভট্ট গোস্বামিনাং কোচিদাহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরী।।

যিনি পূর্বে ব্রজের অনঙ্গমঞ্জরী ছিলেন, তিনি বর্তমানে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী। কেউ কেউ বলেন গোপাল ভট্ট গোস্বামী গুণমঞ্জরী ছিলেন।

একদিন শ্রীনিবাস আচার্য দেখলেন গুরুদেব গোপাল ভট্ট গোস্বামী নিরিবিলিতে শ্রীরাধারমণের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন নিজ কৃত একটি গাথা -

ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডমণ্ডনবর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ হে!
বৃন্দারণ্যপুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবরশ্যামল!
কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ!
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয়।।

যিনি পূর্বে ব্রজের অনঙ্গমঞ্জরী ছিলেন, তিনি বর্তমানে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী। কেউ কেউ বলেন গোপাল ভট্ট গোস্বামী গুণমঞ্জরী ছিলেন।

হে ভাণ্ডীরবনের অধিপতি, হে ময়ূরপুচ্ছধারি, হে চন্দন চর্চিত অঙ্গ, হে বৃন্দাবনের পুরন্দর, হে বিকশিত নীলপদ্মের মতো শ্যামল সুন্দর, হে কালিন্দীপ্রিয়, হে নন্দনন্দন, হে পরানন্দ, হে কমলনয়ন, হে মুকুন্দ, হে কমনীয় দেহ, হে গোবিন্দ, আমি অতিশয় দীন, আমাকে আনন্দ দান কর।

শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভু গৌড়মণ্ডলে ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করতে আসার আগে গোপাল ভট্ট গোস্বামী তাদের শুভ বাসনা সিদ্ধির জন্য বলেন, শ্রীরাধারমণ তোমাদের কৃপা করুন।

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ৭৫ বছর প্রকট ছিলেন। ১৫০৩ খ্রিঃ পৌষ কৃষ্ণ-তৃতীয়াতে আবির্ভাব এবং ১৫৭৮ খ্রিঃ শ্রাবণ কৃষ্ণ-ষষ্ঠীতে অপ্রকট হন।

প্রকৃত গুরু চিহ্নিতকরণ

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

৩য় পর্ব

শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত মুহ্যমান এবং দৃশ্যতই রাগান্বিত ছিলেন। তিনি এইমাত্র আমেরিকার নব বৃন্দাবন থেকে একটি সংবাদ পেলেন যে, চারজন সন্ন্যাসী প্রচার করছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদই হচ্ছেন প্রকৃত কৃষ্ণ এবং ভক্তরা সেই সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ। তিনি বললেন, 'যদি কেউ বলে যে, গুরু হলেন ভগবান, অথবা যদি গুরু নিজেই বলেন, তিনি ভগবান, তাহলে সেটি মায়াবাদী দর্শন .... যদি কেউ বলেন যে, গুরু ভগবান এবং ভগবান কোন ব্যক্তি নন তাহলে তর্কানুসারে এটি প্রমাণিত হয় যে, গুরুর তার শিষ্যদের সঙ্গে কোন নিত্য ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নেই। অবশেষে শিষ্য গুরুর সমকক্ষ হবেন অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, তিনিও উপলব্ধি করবেন যে তিনিও ভগবান।' বৈদিক শাস্ত্র অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে যে, ভগবান সর্বদাই ভগবান এবং অন্য কেউই কখনো ভগবান হতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদাই দৃঢ়তার সঙ্গে মায়াবাদীদের এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন যেখানে তারা প্রচার করেছে যে, যে কেউ এবং প্রত্যেকেই পরিশেষে ভগবান হতে পারে।

হ্যাঁ, এটি সত্য যে, একজন গুরুর প্রতি সেই সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত যেমন ভাবে একজন শ্রীহরির প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করে। কিন্তু গুরু ভগবান নন।

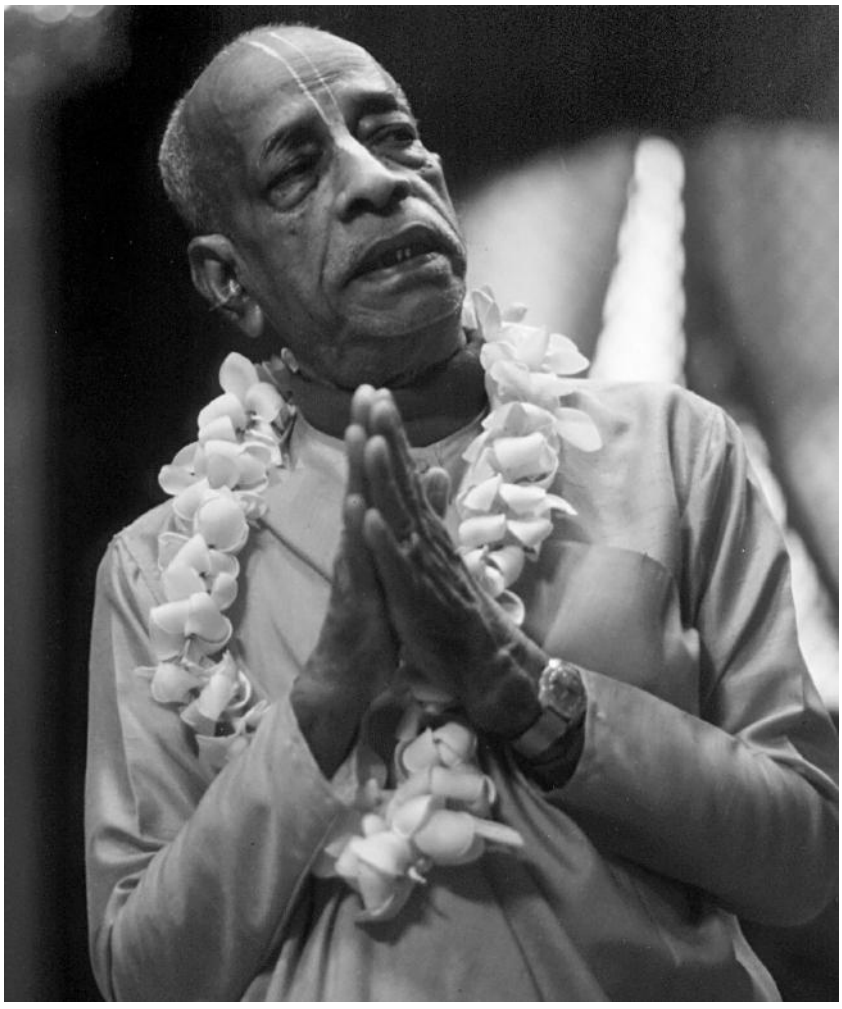

প্রকৃত আধ্যাত্মিক গুরু

একজন শুধুমাত্র গৈরিক বসন অথবা বৈষ্ণব পোশাক পরিধান করে, সর্বাঙ্গ তিলক ভূষিত করে এবং শুধুমাত্র বৈদিক শ্লোক আবৃত্তি করেই গুরু হতে পারেন না। আধ্যাত্মিক গুরুর স্তর প্রাপ্তির জন্য একজনকে তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। ভক্তি জীবনের নির্ধারিত নিয়মাবলী পালন করা। একে বলে সাধন সিদ্ধ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের কৃপা লাভ করা। একে বলে কৃপা সিদ্ধ। এ ছাড়াও নিত্য সিদ্ধগণ রয়েছেন যারা সমগ্র জীবনে মুহূর্তকালের জন্য কৃষ্ণকে বিস্মৃত হন না।

একজন প্রকৃত আধ্যাত্মিক গুরু কোন সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি নিত্য মুক্ত। আধ্যাত্মিক গুরু তার শিষ্যদের আধ্যাত্মিক পিতা। তাঁর বাণী এবং কার্যের দ্বারা তিনি তাঁর শিষ্যদের পরম পিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি যা ভাবেন বা অনুভব করেন সে কথা তিনি বলেন না কিন্তু তিনি সর্বদা তাঁর পূর্ববর্তী আচার্যদের

বাণী পুনরাবৃত্তি করেন এবং প্রত্যেককে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করেন। তিনি একজন আচার্য, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের চিন্ময় শিক্ষক এবং সেই কারণেই তিনি তাঁর শিষ্যদের বৈদিক শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বগুলির শিক্ষা দিয়ে তাদের দ্বিতীয় জন্ম প্রদান করেন।

পরম সত্যকে জানতে যারা ব্যাকুল এবং আন্তরিক তিনি তাদের আশ্রয় দান করেন। একজন আধ্যাত্মিক গুরু কখনো জাতি, পূর্বজন্ম, লিঙ্গ এবং অর্থনৈতিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তার শিষ্যদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেন না। তাঁর কাছে তাঁর শিষ্য কে ব্রাহ্মণপুত্র, কে শূদ্রপুত্র তা নিরর্থক।

গুরু শিষ্য সম্বন্ধ

চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, 'আধ্যাত্মিক গুরুর সঙ্গে তাঁর শিষ্যের সম্পর্ক পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মতো। একজন আধ্যাত্মিক গুরু সর্বদাই নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের দীন সেবক হিসাবে উপস্থাপন করেন কিন্তু শিষ্যের তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিভূরূপে দেখা উচিত।' (চৈ.চ আদি ১-৪৫)

একজন স্বীকৃত শিষ্য অনুধাবন করেন যে, আধ্যাত্মিক গুরু হলেন কৃষ্ণের প্রতিভূ কিন্তু তিনি এও উপলব্ধি করেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় লীলা বিলাস অনুকরণ করার অধিকার আধ্যাত্মিক গুরুর নেই। কখনো কখনো কিছু আধ্যাত্মিক গুরু পরমেশ্বর ভগবানের কার্যাবলীকে অনুকরণ করে তার শিষ্যদের অনুভূতি নিয়ে খেলা করে। তারা তাদের শিষ্যদের বিভ্রান্ত করে তাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে বিনষ্ট করে। একজন আধ্যাত্মিক গুরুর নাম-যশের প্রতি কোন মোহ থাকা উচিত নয়। তিনি কখনোই নাম এবং যশ বৃদ্ধি করার জন্য সমসাময়িক আধ্যাত্মিক গুরুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেন না। তিনি কখনোই অন্যান্য আধ্যাত্মিক গুরুদের সমালোচনা করেন না, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন না এবং তাঁর অনুগামী সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য কোন অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করেন না। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকমে যে নির্দেশাবলী দিয়েছেন তাকে তিনি অনুসরণ করেন, 'হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী রমনী কামনা করি না ; আমি কেবল এই কামনা করি যে, জন্মে-জন্মে তোমাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হোক।'

প্রকৃত গুরু প্রকৃতি অর্থেই বিনয়ী, এবং সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে তিনি নিজেকে তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুর দাসরূপে চিন্তা করেন। ভারতের বৃন্দাবনে একবার একজন শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি কি সমগ্র পৃথিবীর গুরু?' শ্রীল প্রভুপাদ কয়েক মূহূর্ত মাটির দিকে তাকিয়ে মৌন ছিলেন এবং তারপর অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেন, ''না, আমি সকলের দাস। সেটাই সব।''

আধ্যাত্মিক গুরুর সঙ্গে তাঁর শিষ্যের সম্পর্ক পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মতো। একজন আধ্যাত্মিক গুরু সর্বদাই নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের দীন সেবক হিসাবে উপস্থাপন করেন।

গুরু - সাধু - শাস্ত্র

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫-৫-১৮) ব্যাখ্যা আছে, 'যিনি তার শিষ্যদের জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত করতে পারেন না তিনি কখনোই একজন আধ্যাত্মিক গুরু, একজন পিতা, একজন স্বামী, একজন মাতা অথবা একজন পূজ্য দেবতা হতে পারেন না।'

ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হলেই তবে একজন তাঁর শিষ্যদের মুক্ত করে ভগবদ্‌ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। যদি আধ্যাত্মিক গুরু পূর্ববর্তী আচার্যদের রীতিনীতি অনুসরণ না করেন তাহলে তাকে পরিত্যাগ করা চলে।

যখন ভগবান বামনদেব একজন ব্রাহ্মণ রূপে বলি মহারাজের যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়ে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চেয়েছিলেন তখন শুক্রাচার্য বলি মহারাজকে তাঁর এই আধ্যাত্মিক কর্ম থেকে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন। শুক্রাচার্য ব্রাহ্মণকে ভগবান বিষ্ণুরূপে চিনতে পেরেছিলেন এবং তিনি যে বলি মহারাজের নিকট হতে সমগ্র রাজত্ব হরণ করবেন তাও বুঝতে পেরেছিলেন। যদি ভগবান বলি মহারাজের কাছ থেকে সমস্ত কিছু হরণ করেন তাহলে তিনিও ভিখারী হয়ে যাবেন এই ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। শুক্রাচার্য একজন শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন না, তিনি কমবেশী সকাম কর্মের প্রতি আসক্ত ছিলেন। শাস্ত্র নির্দেশ দেয় যে, আমাদের যা কিছু আছে তা সমস্তই পরমেশ্বর ভগবানের এবং সেই জন্য পরমেশ্বর ভগবানের কাছে সমস্ত কিছু নিবেদন করার জন্য আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত (গীতা ৯-২৭)। ভগবানের এক মহান ভক্তরূপে বলি মহারাজ বেদের সকল রীতিনীতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ায় তিনি শুক্রাচার্যের নির্দেশ পালন করেননি, তিনি প্রকৃত অর্থেই তাঁকে প্রত্যাখান করেছিলেন এবং ভগবান বামনদেবের নিকট তাঁর সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন।

বেদ গুরু-সাধু-শাস্ত্র রূপে পরখ এবং তুল্য পদ্ধতি দিয়েছে যার দ্বারা আমরা একজন গুরুকে তিনি প্রকৃত অথবা ভন্ড কিনা যাচাই করতে পারি। গুরুর প্রদত্ত শিক্ষা অবশ্যই সাধুগণের শিক্ষার অনুসারী হতে হবে (গুরু পরম্পরা ধারা অনুসারে) যা সরাসরি শাস্ত্রানুগ। শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেন, 'প্রামাণিক শাস্ত্র অনুসারে একজন আধ্যাত্মিক গুরু যদি নিজেকে গুরুপদের যোগ্য রূপে প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা চলে। একজন গুরুকে আচার্যও বলা হয় যিনি সমগ্র শাস্ত্রের সার এবং তিনি তাঁর শিষ্যদের সেই সমস্ত পন্থা অবলম্বন করতে সহায়তা করেন।' (শ্রীমদ্ভাগবত ১-৭-৪৩ তাৎপর্য)

গুরু, ভগবানের দাস

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ''একজন আচার্যকে আমার স্বরূপ বলে দেখা উচিত এবং কোনভাবেই তাঁকে অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। তাঁকে সাধারণ ব্যক্তি ভেবে কখনোই ঈর্ষা করা উচিত নয় কারণ গুরু সর্ব দেবময়।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১-১৭-২৭)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং অন্যান্য আচার্যগণ পুষ্টিকরণ করেছেন যে, প্রামাণিক শাস্ত্র সকল আধ্যাত্মিক গুরুকে পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপ রূপে গ্রহণ করেছে কারণ তিনি ভগবানের অন্তরঙ্গ এবং প্রিয় সেবক।

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সেই জন্য গুরুদেবকে পরমেশ্বর ভগবানের সেবক রূপে অর্চনা করেন। ভক্তিযোগের সকল প্রাচীন শাস্ত্রে এবং শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং অন্যান্য শুদ্ধ বৈষ্ণবদের কীর্তনে আধ্যাত্মিক গুরুকে সর্বদা হয় শ্রীমতি রাধারাণীর অন্তরঙ্গ সাথীরূপে অথবা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিভূরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।' (শ্রীমদ্ভাগবত ১১-১৭-২৭)।

সন্দর্ভ ঃ শ্রীল প্রভুপাদ-লীলামৃত

পুরুষোত্তম নিতাই দাস কোলকাতা ইসকন ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই.বি.এম -এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত। তিনি ব্লগ লেখেন http:/krishnamagic.blogshot.co.uk/

আপনি কি ভগবৎ-দর্শন পাচ্ছেন না ?

পাঠক ভিক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

(033) 2289 6446
9073791237

btgbengali@gmail.com

মূর্খ ভ্রমর

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষামূলক গল্প হতে গৃহীত

এক ভ্রমর বাগানে ফুলের মধু পান করছিল ... একদা সে মধুপূর্ণ একটি স্বচ্ছ বোতল দেখতে পেল।

কেন আমি ফুল থেকে মধুপান করার কঠিন কর্ম করবো? এখানে অনেক মধু আছে। এখন আমি এটাই পান করবো।

কাঁচের বোতলে মধু আবদ্ধ আছে এই বিষয় না জেনেই মূর্খ ভ্রমর বারংবার মধু আস্বাদনের প্রয়াস করতে লাগল।

হায়! ভ্রমর মধুর মিষ্টত্ব আস্বাদন তো দূরের কথা মধুকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারল না।

মূর্খ ভ্রমর প্রতারিত এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে গেল।

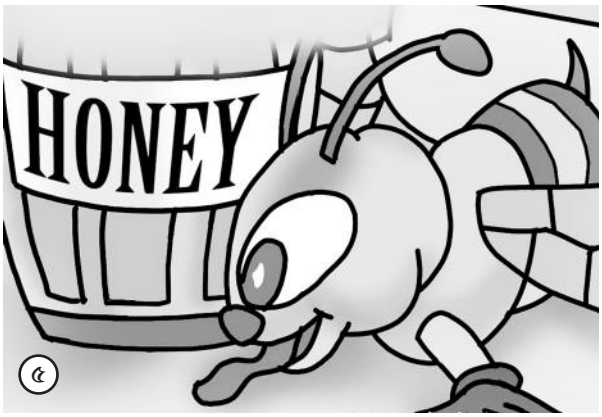

তাৎপর্য ঃ জড়বাদী ব্যক্তিরা কখনো কৃষ্ণ এবং শাস্ত্রকে অনুধাবন করতে পারে না। কারণ তারা তাঁদের প্রতি ভক্তি সহকারে অগ্রসরের প্রয়াস করে না। তাই তারা ভক্তির রসামৃত আস্বাদন করতে পারে না। কেবল মাত্র আমরা ভক্তিযোগের মাধ্যমেই কৃষ্ণভাবনামৃতের আবরণ উন্মোচন করতে পারি এবং তা আস্বাদন করতে পারি।

পালং পনির

উপকরণ ঃ

পালং শাক ৫০০ গ্রাম। পনির ২৫০ গ্রাম। আদা ১ টুকরো। জিরা ২ চা-চামচ। ছোট এলাচ ৪টি। লবন ও হলুদ পরিমাণ মতো। ঘি ১ টেবিল-চামচ। শুকনো লংকা ২টি। জয়ত্রী ১ চিমটি। চিনি সামান্য। তেজপাতা ২টি। কাঁচা লংকা ৪টি। তেল ১০০ গ্রাম।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ

প্রথমে পালং শাক বেছে নিয়ে ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে বেটে নিন। পনির ছোট ছোট টুকরো করুন। এলাচ, জয়ত্রী, জিরা, একসাথে শুকনো কড়াইতে ভেজে গুঁড়ো করে নিন। আদা বেটে নিন। কাঁচা লংকা বেটে নিন।

উনানে কড়াই বসিয়ে তেল দিয়ে পনির হালকা ভেজে তুলে নিন। কড়াইতে যেটুকু তেল থাকবে তার মধ্যে ঘি দিয়ে শুকনো লংকা, তেজপাতা, একটু গোটা জিরা ফোড়ন দিন। জয়ত্রী-জিরা-এলাচ গুঁড়ো দিন। আদা বাটা দিন। খুনতিতে নাড়িয়ে দিন। তারপর হলুদ গুঁড়ো দিন। বাটা পালং শাক ঢেলে দিন। ভাজা পনির ঢেলে দিন। নাড়িয়ে দিন। কাঁচা লংকা বাটা দিয়ে ঢাকনা চাপা দিন। দশ মিনিট হালকা আঁচে ফুটতে দিন। তারপর নামিয়ে নিন।

রুটির সাথে গরম গরম এই পালং পনির শ্রীশ্রীরাধামাধবকে ভোগ নিবেদন করুন।

— রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

দুর্ভাগ্য সহনের স্তর

চৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারী

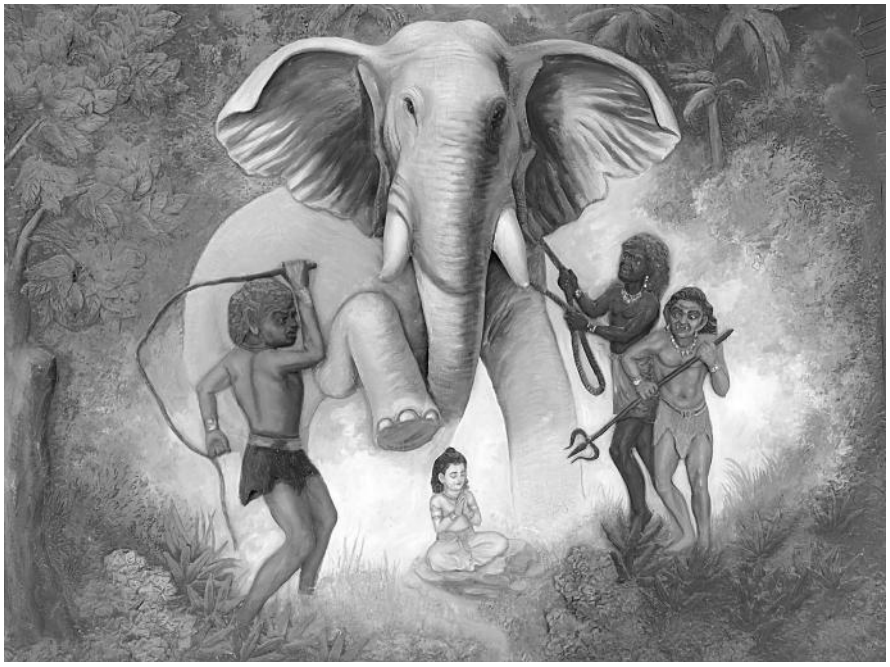

খলভাতো দিবসেশ্বরস্য কিরণৈ র্সন্তপিতে মস্তকে
বঞ্চন দেশম্ অনতপম্ বিধিবশত তালস্য মূলম্গত।
তত্রাপি অস্য মহাফলেনা পতত ভগ্নম্ সশব্দম্ শির
প্রায় গচ্ছতি যাত্রা ভাগ্য রহিতস্ তত্রৈব যান্তি আপদ।।

খলভাতো — টাকমাথা ব্যক্তি, দিবসেশ্বরস্য — সূর্যের, কিরণৈঃ— কিরণ দ্বারা, সন্তপিতে — দগ্ধ অনুভব করা, মস্তকে — মাথায়, বঞ্চন — অভিলাষ, দেশম্ — স্থান, অনতপম্ — তাপ রহিত, বিধি-বশতঃ — ভাগ্য অনুযায়ী, তালস্য — তাল বৃক্ষের, মূলম্ — নিচে, গত — যায়, তত্রাপি — সেখানেও, অস্য — তার, মহাফলেনা — বড় তাল, পতত — পতনের দ্বারা, ভগ্নম্ — ভেঙ্গে যাওয়া, সশব্দ — সশব্দে, শির — মাথা, প্রায় — সাধারণত, গচ্ছতি— যায়, যাত্রা — যত্রতত্র, ভাগ্য রহিত — দুর্ভাগা ব্যক্তি, তত্রৈভ— সেখানেও, যান্তি — যায়, আপদ — ভাগ্য বিড়ম্বনা।

একজন কেশহীন ব্যক্তি সূর্যের তাপে দগ্ধ হচ্ছিলেন। তিনি তাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভাগ্যক্রমে একটি তালগাছের নিচে আশ্রয় খুঁজে পেলেন। এই কষ্ট থেকে মুক্তি পেলেও তার মাথায় একটি বড় তাল সশব্দে পড়ে ভেঙ্গে গেল। বস্তুত একজন দুর্ভাগা ব্যক্তি যে দিকে যায় দুর্ভাগ্যও তাকে অনুসরণ করে। (নীতিশতক ভর্তৃহরি শ্লোক ৯০)

কখনো কখনো আমরা এমন দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে যাই যখন একের পর এক বিড়ম্বনা দেখা দেয়। যখনই আমরা কোন কিছু ঠিক করতে যাই তখনই সেটা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ায়।

গীতার জ্ঞান আমাদের বোঝাতে সাহায্য করে যে, এই সময়গুলি আমাদেরকে আমাদের অতীত কর্মের সঞ্চিত কর্মফল থেকে মুক্ত করে। এই সময়গুলি থেকে পার হওয়ার জন্য অথবা শুধুমাত্র জীবিত থাকার জন্য আমাদের ধৈর্য এবং সহ্যের প্রয়োজন। অধিক উত্তেজিত প্রতিক্রিয়া পরিস্থিতিকে অধিকতর খারাপ করে এমন কি ধ্বংসও হতে পারে।

এর অর্থ কি এই যে, আমরা পরিস্থিতিকে অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দেব এবং কোন সমাধানের চেষ্টা করবো না? না, বৈদিক ঐতিহ্য অদৃষ্টবাদী ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ, এই ঐতিহ্য কখনোই একজন অসুস্থ মানুষকে বলে না যে, তুমি শুধু তোমার যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকো; বরং অত্যন্ত সমৃদ্ধ চিকিৎসা বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ দ্বারা তার আরোগ্যের ব্যবস্থা করো।

তথাপি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে এটা স্বীকার করে যে, কখনো কখনো আমাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন কিছুই কাজ করে না। এই সময়গুলিতে উন্মত্ত কার্যের থেকে দার্শনিক ভাবনা-চিন্তা করা শ্রেয়। এই চিন্তা-ভাবনাগুলি করার জন্য আমাদের মধ্যে দুর্ভাগ্যকে সহন করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন — অসহনীয়তা আমাদের উত্তেজিত করে তোলে যার ফলে আমরা দ্রুত এক সমাধান থেকে অন্য সমাধান চিন্তা করতে থাকি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আধুনিক চিন্তাধারা আমাদের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সর্বাধুনিক চিন্তাধারা স্বসংকল্প আদর্শের উপর স্থাপিত যা আমরা আমাদেরই ভাগ্য নিয়ন্তা এই ভাবকে পুষ্টি প্রদান করে। আমাদের বুদ্ধিমত্তা

এবং প্রয়াসের দ্বারা যা কিছু অবাঞ্ছিত তাকে দূর করে আমাদের সমস্ত বাঞ্ছিত লাভ করতে পারি, অথবা আমাদেরকে এটাই বিশ্বাস করতে শেখানো হয়। আমরাই আমাদের জীবন নিয়ন্তা এই মতবাদটি আমাদের বিশ্বদর্শনের মধ্যমণি, যে পরিস্থিতিকে আমাদের ইচ্ছানুসারে বদলানোর ক্ষমতা অনুযায়ী আমরা আমাদের সাফল্য এবং মূল্য নির্ধারণ করি। এই মতামত পোষণ করার জন্য অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি আমাদের শুধু হতাশই করে না — ধ্বংস করে দেয়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, আধুনিকতার প্রসারের সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।

যদি আমরা আবেগপ্রবণ না হয়ে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হতে চাই তাহলে সর্বনিয়ন্তার প্রতি আমাদের দুর্বল বিশ্বাসের মোকাবিলা করতে হবে। গীতার জ্ঞান এই ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুর স্তর হিসাবে আমাদের স্থান এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উন্নত উপলব্ধি প্রদান করে, ভগবদ্গীতায় (১৫-৭) বলা হয়েছে যে, আমরা হলাম আত্মা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ। তিনি হলেন সর্বনিয়ন্তা এবং তাঁর অংশ হিসাবে আমরা আংশিক নিয়ন্তা। তাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অসীম, কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আমাদের এই সীমাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাঁর সেবার কাজে ব্যবহার করার জন্য প্রদত্ত হয়েছে। সে যে অবস্থাতেই আমাদের জীবন প্রবাহিত হোক না কেন। দুর্ভাগ্যের পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতি যে সেবা সর্বোত্তম উপায়ে আমরা করতে পারি তা হলো সহিষ্ণুতা।

কষ্টকে সহ্য করার অর্থ এই নয় যে, আমরা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছি; এর অর্থ এই যে, আমাদের প্রথমে আধ্যাত্মিক উত্তরণের জন্য কর্ম করা উচিত, জড়জাগতিক সংশোধনের জন্য নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৮-৫৮) আমাদের উপদেশ দেয় ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতে যা আমাদের জড় জাগতিক বাস্তবতার চেতনা স্তরকে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করে যেখানে আমরা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে মুক্তি দেখতে পাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে এমন বহু ভক্তের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যারা তাদের প্রতিকুলতাকে আধ্যাত্মিকতা এবং ভক্তিমূলক সেবা কার্যের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন যা তাদের সহনশীলতাকে পরিস্ফুট করে চিন্ময়ত্বে উত্তীর্ণ করেছে। এর প্রধান উদাহরণ শুরু হচ্ছে মহান রাজা পরীক্ষিতকে দিয়ে, যিনি ক্ষুদ্র অপরাধের কারণে অন্যায়ভাবে চরম শাস্তির অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই অভিশাপের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ না নিয়ে বা এর জন্য ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত না হয়ে তিনি নিজেকে কৃষ্ণকথা শ্রবণে মগ্ন করেছিলেন যার ফলে দেহাত্মবোধ থেকে চিন্ময়ত্বে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর নশ্বর দেহ নির্ধারিত গতি প্রাপ্ত হওয়ার আগেই তাঁর আত্মা মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল যা ঈর্ষান্বিত জড়জাগতিক প্রয়াসকারীদের দ্বারাও লাভ করা সম্ভব নয়।

যদি আমরাও কোন ভক্তিমূলকসেবা কার্যে নিয়োজিত হই, সেক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১০-১০) নিশ্চিতভাবে এই আশ্বাস দেয় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর থেকে আমাদের নির্দেশ দেবেন যাতে আমরা সেই পথ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নির্বাচন করতে পারি যাতে আমরা তাঁর নিকটে ফিরে যেতে পারি।

যখন আমরা প্রতিকুলতার সম্মুখীন হই তখন যদি আমরা আমাদের চেতনাকে আধ্যাত্মিক স্তরে প্রথমেই উন্নীত করতে পারি তাহলে আমরা সেই বুদ্ধিমত্তা প্রাপ্ত হবো যাতে আমরা জড়জাগতিক স্তরে সেবামূলক মনোভাব নিয়ে সঠিক কার্য করতে পারি। এইরূপে প্রতিকুলতাকে সহ্য করার শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা তাদের অতিক্রম করবো, এবং তাদের মাধ্যমে কৃষ্ণের সমীপেও অগ্রসর হব।

চৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারী ভগবৎ-দর্শনের ইংরেজী সংস্করণ 'ব্যাক টু গড হেড'-এর সম্পাদকীয় মন্ডলের সদস্য।

গ্রাহক নবীকরণ বিজ্ঞপ্তি

হরেকৃষ্ণ, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাশীর্বাদ গ্রহণ করুন। মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' ও পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার আপনি একজন গ্রাহক। আপনার গ্রাহক পদের মেয়াদ কোন্ সংখ্যায় শেষ হচ্ছে? সেটি জানতে লক্ষ্য করুন —

মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' ও পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার খামে যেখানে আপনার নাম, ঠিকানা রয়েছে তাতে পত্রিকার গ্রাহক মেয়াদ কবে শেষ হবে শেষ দুটি সংখ্যায় তার উল্লেখ থাকবে।

মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' ও পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার বাৎসরিক পাঠক ভিক্ষা ২০০ (দুইশত) টাকা। আপনি ইসকনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করে অথবা মানি-অর্ডার করে উক্ত টাকা পাঠিয়ে পুনরায় এক বা একাধিক বছরের জন্য আপনার গ্রাহক পদে স্থিত থেকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবায় নিয়োজিত থাকুন। আপনার পূর্ণ নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর স্পষ্ট করে বড় অক্ষরে লিখবেন এবং আপনার পোস্টাল পিন কোড উল্লেখ করবেন।

বিঃদ্রঃ - E.M.O. এ ঠিকানা সম্পূর্ণ লেখা না থাকায় দয়া করে আপনার পূর্ণ নাম, ঠিকানা, পোস্টাল পিন কোড সহ ফোন করে আমাদের জানান।

পাঠক ভিক্ষা পাঠানোর ঠিকানা ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া-৭৪১৩১৩
ফোন ঃ ০৩৪৭২-২৪৫২১৭, ২৪৫২৪৫

যাদের গ্রাহকপদ নবীকরণ করা হয়েছে, তাদের জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রযোজ্য নয়।

বুক পোস্টে ভগবৎ-দর্শন ও হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার পত্রিকার পাঠক ভিক্ষা

১ বছরের জন্য	ঃ	২০০ টাকা
২ বছরের জন্য	ঃ	৪০০ টাকা
৩ বছরের জন্য	ঃ	৫৭০ টাকা

ক্যুরিয়ার সার্ভিস যোগে পত্রিকা দুটির পাঠক ভিক্ষা

১ বছরের জন্য (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে)	ঃ	৩৮০ টাকা
১ বছরের জন্য (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে)	ঃ	৬০০ টাকা

রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পত্রিকা দুটির পাঠক ভিক্ষা

১ বছরের জন্য ঃ ৪৩০ টাকা

হরেকৃষ্ণ, এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আপনারা আপনাদের পাঠক ভিক্ষা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করুন।

Name: ISKCON, Account No : 005010100329439
AXIS BANK (Kolkata Main Branch)
7 Shakespeare Sarani, Kolkata, IFSC : UTIB0000005

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

ল্যাটিন গ্রামিতে হবি দাস-এর কৃষ্ণভাবনামৃত সম্বন্ধে বক্তৃতা দান

শ্রীল প্রভুপাদ শিষ্য এবং জনপ্রিয় ভেনিজুয়েলান সংগীত শিল্পী হবি দাস (ইলান চেষ্টার) সম্প্রতি ল্যাটিন গ্র্যামি পুরস্কার গ্রহণ কালে একটি গভীর এবং শক্তিশালী কৃষ্ণভাবনাময় বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৫ই নভেম্বর অষ্টাদশতম বার্ষিক ল্যাটিন গ্র্যামি পুরস্কারের দিনে লাস ভেগাসে ফোর সিজনস্ হোটেলে একটি বিশেষ পুরস্কার বিতরণী সমারোহে হবিকে লাইফটাইম অ্যাচিভম্যান্ট পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

মঞ্চে হবি দাস-এর পরিচয় প্রদান করার সময় ল্যাটিন রেকর্ডিং অ্যাকাডেমির ট্রাস্টি ইভা সেব্রিয়ান তাঁর দীর্ঘ সাফল্যময় সঙ্গীত জীবনের জন্য প্রশংসা করেন। হবি দাস মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে ভেনিজুয়েলায় পিয়ানো বাজিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। যৌবনে তিনি রক এবং পপ ব্যান্ডের সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন এমন কি ১৯৭৯ সালে কুইন ব্যান্ডেও যোগদান করেছিলেন।

মায়াপুর ইনস্টিটিউটের প্রথম শ্রেণীকক্ষ কুটির শিক্ষাদানের জন্য সর্বতোভাবে উপযুক্ত

১৫ই অক্টোবর ইসকনের মায়াপুর ইনস্টিটিউট তার প্রথম শ্রেণীকক্ষ কুটিরের উদ্বোধন করল, যেটিতে বৈদিক শাস্ত্র পঠনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক এবং পরিবেশ সহায়ক স্থানীয় উপরকণ যেমন বাঁশ, ইঁট এবং খড় সহযোগে তৈরী কুটির ছাত্রদের অনুভব করায় অতীতের মুনি-ঋষিদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নের

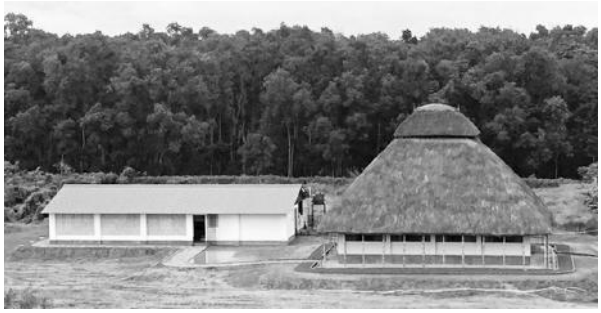

দিনগুলি। মায়াপুর ইনস্টিটিউটের নির্দেশক পদ্মনয়ন দাস বলেন, 'অতীত এবং আধুনিকতার এই সংমিশ্রণটি আদর্শ।' অনেক ছাত্র মন্তব্য করেছেন যে, 'কুটিরে প্রবেশ করলেই আমাদের অধ্যয়ন করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়।'

বিপুল সংখ্যক ভগবদ্গীতা মুদ্রণের জন্য বি.বি.টি. ব্রাজিলের পরিকল্পনা সফল

সমগ্র পৃথিবীতে অজ্ঞানতা এবং দুর্দশা লাঘবের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের অনুরোধ ছিল কৃষ্ণভাবনামৃতের উপর লিখিত তাঁর গ্রন্থসমুহ অধিক সংখ্যায় মুদ্রণ করা।

বি.বি.টি দল অনুদান সংগ্রহের জন্য একটি মঞ্চ প্রস্তুত করেছিল, এর কিছুদিন পরে এই প্রচারটি নতুন গতি পায় এবং লক্ষ্যের শতকরা পঁচাত্তর শতাংশ স্থিতিতে পৌঁছায় প্রায় তিনশত সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে!

অবশেষে তিনদিন বাকি থাকতেই এটি লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায়। শেষ তিনদিনে এর লক্ষ্য উত্তীর্ণ করে ১,৭০,০০০ ডলার (৫২,০০০ USD) সংগৃহীত হয়! এইরূপে পূর্ব প্রতিশ্রুত গ্রন্থের তুলনায় উত্তম গ্রন্থ মুদ্রণ করা সম্ভব হয়েছে। অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ না করেই বি.বি.টি গ্রন্থগুলি প্রকাশ করবে যা উন্নতমানের গ্রামেজ কাগজ এবং ফ্রেঞ্চ ফ্লিপ কভার সমৃদ্ধ হবে।

ইসকন নাসিক কর্তৃক শিক্ষকদের জন্য গীতা প্রতিযোগিতার আয়োজন

৫ই নভেম্বর ২০১৭ রবিবার ইসকন নাসিক শিক্ষক এবং বিদ্যালয় কর্মীদের জন্য একটি ভগবদ্গীতা প্রতিযোগিতার (গীতা প্রাঞ্জশোঠ পরীক্ষা-২০১৭) আয়োজন করেছিল। নাসিক শহর এবং নাসিক জেলার কিছু শহরে একশোরও বেশী বিদ্যালয়ের প্রায় ১৭০০ শিক্ষক এই প্রতিযোগিতার জন্য নাম তালিকাভুক্ত করেন।

বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য ভগবদ্গীতা প্রতিযোগিতা সাফল্যমন্ডিত হয়েছে, যাতে তিন হাজারের বেশী ছাত্র অংশগ্রহণ করেছে। শিক্ষাষ্টকম দাস (ইসকন নাসিক প্রধান, মহারাষ্ট্র, ভারত) ভবিষ্যতে শিক্ষকদের জন্য এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন।

১২ই নভেম্বর ২০১৭ ইসকন নাসিকে এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সুব্রমনীয়ম স্বামী (রাজ্যসভা সদস্য), যিনি পূর্ববর্তী বাণিজ্য এবং আইন মন্ত্রী, এই উৎসবের প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

ইসকন তুরীন, ইটালী নতুন কেন্দ্র উদ্বোধন

ইসকন তুরীন মন্দিরে আনন্দময় কীর্তন সমারোহে ৫ই নভেম্বর ইটালী ইসকন তুরীন শহরের ডাউনটাউনে একটি নতুন মন্দির উদ্বোধন করল।

পূর্ববর্তী মাসগুলিতে পুরাতন কেন্দ্রে কিছু প্রতিবেশী নানাভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল। ভক্তরা কীর্তন করতে পারতেন না এবং অন্যান্য অসুবিধার কারণে অতিথিরা মন্দির দর্শনে বাধা প্রাপ্ত হতেন।

অবশেষে মন্দির অধ্যক্ষ প্রভু দাস আবাসিকগণকে পরামর্শ দেন অন্যত্র মন্দির স্থানান্তরিত করতে যেখানে তারা বাধামুক্তভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা উচ্চৈস্বরে কীর্তন করতে পারেন।

এরপর তারা নতুন স্থানের সন্ধান করতে থাকেন। কয়েক সপ্তাহ পর তারা নিকটস্থ বাড়িতে স্থান পান যেখানে তারা পূর্বে ফুড ফর লাইফ অনুষ্ঠান করেছেন। বর্তমানে তা খালি ছিল এবং কাউকে ভাড়া দেবার জন্য খোঁজা হচ্ছিল।

অনেক ভক্ত এবং প্রচারক সদস্যদের সহায়তায় তারা অবশেষে অক্টোবর মাসে এটি ভাড়া নিতে সক্ষম হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নভেম্বরের প্রথম রবিবারে এর উদ্বোধন হয়।

ইসকন খাদ্য প্রকল্পে ঐশ্বর্য রাই বচ্চন-এর অংশগ্রহণ

সরকারী সূত্রে খবর - বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এক হাজার অপেক্ষাকৃত কম সুবিধা প্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের অন্নামৃত মিড ডে মিল প্রকল্পের মাধ্যমে নিঃশুল্ক খাদ্য প্রদান করেন।

১লা নভেম্বর তার চুয়াল্লিশতম জন্মদিন উদ্যাপন উপলক্ষে এই সিদ্ধান্ত। ইসকন চৌপাট্টির প্রধান শ্রীমৎ রাধানাথ স্বামী মহারাজ বললেন, এতে করে ছেলে-মেয়েদের বিপুল লাভ হবে।

তিনি বলেন, অন্নামৃত মিড ডে মিল প্রকল্প যা ২০০৪ সালে একটি ছোট্ট কক্ষের মধ্যে নয়শত লোকের খাবার নিয়ে শুরু হয়েছিল, আজ তা ২০টি ISO স্বীকৃতি প্রাপ্ত কিচেনের মাধ্যমে সাত রাজ্যের ১ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশী ছেলে-মেয়েদের খাদ্য প্রদান করছে। এই ভাবনাটির মূল সূত্র স্মরণ করতে গিয়ে শ্রীমৎ রাধানাথ স্বামী মহারাজ বলেন যে, তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ একদা দেখেছিলেন যে, একটি খাবার প্যাকেট ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পর কিভাবে একটি শিশু এবং কয়েকটি কুকুর তা খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে যা তাকে চরম ব্যথা দিয়েছিল।

বৃন্দাবন এবং বর্ষাণা সরকারীভাবে ঘোষিত স্বীকৃত তীর্থ স্থান

বৃন্দাবন, ভারত ঃ উত্তর প্রদেশ সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, এখন থেকে বৃন্দাবন এবং বর্ষাণা তীর্থস্থল

সরকারীভাবে স্বীকৃত তীর্থস্থান। পরিক্রমা মার্গে বৈরাগী বাবা আশ্রমে এক বিশেষ সভাতে সরকারের এই সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

এই ঘোষণাকে দুই শহরের আবাসিকরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান, কিন্তু বৃন্দাবন এবং বর্ষাণার কাছে এর প্রকৃত অর্থ কি ছিল সেটি গবেষণার বিষয়।

বৃহস্পতিবার নিকটবর্তী আগ্রা পরিদর্শনের সময়, উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্য নাথ তাঁর দলের সম্ভাব্য ভাবনা-চিন্তার ওপর কিছু আলোকপাত করেন। ধর্মীয় পর্যটনই এই সিদ্ধান্তের মূল বস্তু।

যদিও মথুরা এবং বৃন্দাবন এই বছর মিলিত হয়ে 'মথুরা বৃন্দাবন নগর নিগম' তৈরী হয়েছে। মথুরার সংস্কৃতি বৃন্দাবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, বৃন্দাবনে বৈষ্ণবদের শতাব্দী ধরে প্রাচীন আধিপত্য, মাংস, ডিম এবং মদ শহরের মধ্যে নিষিদ্ধ। যদিও বৃন্দাবনের 'নিষিদ্ধ বস্তু' মথুরাতে আইনত বেচা কেনা করা যায়। এখন সেই বৃন্দাবন সরকারীভাবে তীর্থস্থল ঘোষিত হওয়ায়, মদ, মাংস ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ।

৪০ বছর ধরে মানুষের হৃদয় জয় করলেন ভক্তিবেদান্ত কলাকুশলীরা

৪ঠা নভেম্বর যুক্তরাজ্যে ভক্তিবেদান্ত কলাকুশলীরা 'দিওয়ালী অ্যাট দ্য প্যালেস' অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে ঐতিহাসিক ওয়াটফোর্ড প্যালেস থিয়েটারে প্রায় ছয়শো জন টিকিটধারী দর্শকের সামনে ধর্মীয় মহাকাব্য রামায়ণ নাটক পরিবেশন করেন।

চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে নাটক পরিবেশন করে ভক্তিবেদান্ত ম্যানরের কলাকুশলীরা স্থানীয় ইংরেজ আবাসিক এবং ইসকন দুনিয়াতে খুব আদরণীয় এবং আকাঙ্ক্ষিত। আসলে এটি ১৯৭০ সালে 'CIT (চৈতন্যের তাৎক্ষণিক প্রেক্ষাগৃহ)' নামে শুরু হয়েছিল এবং ১৯৭৬ সালে ভক্তিবেদান্ত কলাকুশলী গ্রুপ নামে খ্যাত হয়। ভক্তরা ভক্তির প্রতি আলোকপাতে উৎসাহী হয়েছিল যখন শ্রীল প্রভুপাদ মুকন্দ গোস্বামীকে বলেন যে, ইংল্যান্ড নাটক সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ, তাই এই নাট্য সংস্কৃতি দিয়েই একে 'জয়' করা যাবে।

এমনি এক ঘটনা যেখানে একজন পাশ্চাত্য দেশীয় যার না বৈদিক সংস্কৃতি না কোন ভক্তের সঙ্গে যোগ ছিল, একটি নাটক দেখার পর অশ্রুসজল চোখে জয়কৃষ্ণের কাছে এসে বলেছিল, 'আমি পূর্বে এইভাবে কখনো ভাবাবেগে আপ্লুত হইনি যা আপনার নাটক দেখার পর হয়েছি।'

অন্য একটি ঘটনাতে, এক হিপী যে সদ্য ভক্তিবেদান্ত ম্যানরে জন্মাষ্টমী উৎসব অর্থাৎ 'ভগবান কৃষ্ণের জন্ম' দেখে এত অভিভূত হয়েছিল যে, সে সেই স্থান পরিত্যাগ করতেই পারে নি। পরের দিন সে তার মস্তক মুন্ডন করেই মন্দিরে প্রবেশ করেছিল।

হিন্দু ফোরাম-এর বেলজিয়ামে সরকারী সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা

হিন্দু ফোরাম অব বেলজিয়াম (HFB) এর প্রতিনিধিবর্গ, ইসকনের দুইজন ভক্ত এবং অনেক গণ্যমান্য ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ভারতের দিল্লীতে, গত সপ্তাহে বেলজিয়ামের রাজা এবং রানীর সঙ্গে মিলিত হন। লক্ষ্য এই ছিল যে, হিন্দু ধর্মকে বেলজিয়ামে সরকারীভাবে স্বীকৃতি প্রদান করানো।

প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে মহাপ্রভু দাস — সাধারণ সম্পাদক, HFB ও ডাইরেক্টর কমিউনিকেশন ইউরোপ; মালতী দাসী— HFB এক্সিকউটিভ বোর্ড মেম্বার ও ইসকন রাধাদেশের উপ-সভাপতি এবং মহিলা ব্যবসায়ী ও সমর্থক কান্তাও ডিডো উপস্থিত ছিলেন।

মহাপ্রভু দাস বলেন, যখন বেলজিয়ামে সমস্ত ধর্মই স্বাধীনভাবে চলতে পারে সেখানে কেবলমাত্র ছয়টি ধর্ম সরকারীভাবে স্বীকৃত — ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টান, অ্যাংলিকান, অর্থোডক্স, জুডাস এবং ইসলাম। বৌদ্ধ ধর্মও স্বীকৃতির পথে।

২০০০ সালে, ইসকনই ছিল একমাত্র সংস্থা যা হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য হিন্দু ফোরাম অব বেলজিয়াম গঠন করেছিল। ফোরাম সদস্যরা এখন তিনটি মন্দিরকে সংযুক্ত করেছে — অন্তরীপ, ব্রাসেলস এবং রাধাদেশ। ভক্তিবেদান্ত কলেজ ও তৎসহ ভারতবর্ষ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মরিশাস এবং আফগানিস্তান থেকে হিন্দু ফোরাম এর প্রারম্ভ থেকে HFB হিন্দুত্বের সরকারী সমর্থন পাবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভের সহজ উপায়

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

ভগবানের অনন্ত অবতার আছে — বিভিন্ন কার্য সাধন করার জন্য তাঁরা আসেন বিভিন্ন রূপ ধারণ করে — যেমন গর্ভোদক সমুদ্র হতে পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য ভগবান শূকর রূপ ধারণ করলেন। ঠিক তেমনি কলি যুগের জীব এতই অধঃপতিত তারা কখনই ভগবানের প্রতি শরণাগত হতে চায় না এমন কি ভগবান সম্বন্ধীয় কথাও শুনতে চায় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন স্বয়ং আমি এমন ভাবে করুণা বিতরণ করব যাতে কেউ বাদ না পড়ে, যোগ্য-অযোগ্য বিচার না করে অকাতরে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করব। কিন্তু একা আমি কিভাবে বিতরণ করব। তাই আমার ধাম ও পার্ষদদের নিয়ে অবতরণ করব।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি।
সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি।।

কলিযুগের যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তন করার জন্য ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে তাঁর অনেক ভক্তকে বিভিন্ন জায়গায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রেরণ করে দিলেন —

নানা স্থানে 'অবতীর্ণ' হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈলা সবার মিলন।।
(চৈ. ভা. আ ২/৩২)

তাই আমরা দেখতে পাই, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ১২ বৎসর পূর্বে রাঢ় দেশে একচক্রা নামক গ্রামে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু ইংরেজী ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারী মধ্যাহ্ন সময়ে আবির্ভূত হন।

রাঢ় দেশে একচাকা নামে গ্রাম ধন্য।
যঁহি নিত্যানন্দ রাম হৈলা অবতীর্ণ।।

ভগবান যেখানে জন্মগ্রহণ করেন এবং লীলা বিলাস করেন সেই জায়গাটিকে বলা হয় 'ধাম'। আর সেই জায়গাটি জড় জগতের কোন স্থান নয়, সেটি চিন্ময় জগতের অংশ। এই গোপন রহস্যময় পরম সত্যকে উল্লেখ করেছেন শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে। দ্বাপর যুগের শেষে মা কুন্তীদেবী সহ পঞ্চপান্ডব ভ্রমণকালে একচক্রা গ্রামে কিছু দিন অবস্থান করলেন। একদিন শয়নকালে যুধিষ্ঠির মহারাজ মনে মনে বিচার করলেন একচক্রা ভূমির ন্যায় পরম সৌন্দর্যে কোথাও মন আকৃষ্ট হয়নি। তাই মনে হয় এই স্থানটি শ্রীভগবানের লীলা ভূমি। রাত্রে স্বপ্ন যোগে শ্রীবলরাম দর্শন দিয়ে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং একচক্রা

গ্রামে তিনি স্বয়ং নিত্যানন্দ রূপে আবির্ভূত হবেন কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায়; তার ইঙ্গিত দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। এইভাবে আমরা বুঝতে পারি, ভগবানের ধাম নিত্য এমনকি নিত্যানন্দ এই নামকরণটির পিছনে একটি সুন্দর কারণ আছে — জনশ্রুতি এই যে, হাড়াই পন্ডিতের স্ত্রী শ্রীমতি পদ্মাবতীদেবী যখন আসন্ন প্রসবা তখন এক মুনিশ্রেষ্ঠ এখানে এসে দু-হাত তুলে 'এখানে গর্ভবাস', 'এখানে গর্ভবাস' বলে মহানন্দে নৃত্য করতে করতে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবলরামের নিত্যানন্দ স্বরূপে জন্ম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং মহানন্দে বলেছিলেন মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী দিবসে তাঁর শীঘ্র প্রকাশ 'নিত্যানন্দ', 'নিত্যানন্দ'। এইরূপ দিব্য ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে তিনি অন্তর্হিত হন। কেউ কেউ বলে থাকেন এই মুনিবর ছিলেন ব্রজলীলায় গর্গ মুনি।

'নিত্যানন্দ' অর্থাৎ যিনি সবসময় আনন্দে থাকেন এবং অন্যদেরও আনন্দ প্রদান করেন। তাই নিত্যানন্দ রাঢ় দেশে একচক্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করা মাত্রই সকলেই যেন এক দিব্য আনন্দে উদ্ভাসিত হলো এবং সকলের মুখে এক দিব্য আনন্দের প্রকাশ দেখা গেল। আর নিত্যানন্দ প্রভুর খেলাধুলার সব কিছু কৃষ্ণকেন্দ্রিক ছিল। তাই আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই খুব আনন্দ অনুভব করতেন। একসময় দুপুরে স্নানের সময় কথিত আছে বলরাম নিতাই আকর্ষণ করে যমুনাকে নিয়ে এসেছিলেন। ঐ যমুনাটি এখনও আছে ছোট নালার মতো সরু এবং আঁকাবাঁকা। তার পাশে একটি খেজুর গাছ ছিল, তার পাতা ধরে নিত্যানন্দ প্রভু দোল খেতেন বন্ধুদের নিয়ে এবং যমুনার জলে পরে সাঁতার কাটতেন। একসময় স্নানের সময় একজন পরিব্রাজক তাঁর পূর্বপুরুষের লাঠি হাতে ধরে স্নান করছিলেন। ঐ সময় নিতাই তাঁর হাতের লাঠিটি নিয়ে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমার পূর্বপুরুষের দেওয়া লাঠিটি ফেলে দিল, কি চঞ্চল ছেলেরে বাবা।' নিতাই আনন্দে হাসতে হাসতে বললেন, 'চিন্তা করবেন না ব্রাহ্মণ; আপনি বৃন্দাবনে যমুনায় পেয়ে যাবেন।' সত্যি যখন বৃন্দাবনে গিয়ে যমুনায় ডুব দিয়ে স্নান করার সময় পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ লাঠিটি পেয়ে গেলেন।

এইভাবে নিত্যানন্দ প্রভু একচক্রা গ্রামকে শুধু নয়, সারা জগতকে নিত্য আনন্দময় করে তুলবেন এই ইচ্ছা হৃদয়ে প্রকাশ করে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দ্বাদশ বৎসরে গৃহ ত্যাগ করে কুড়ি বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলন হওয়ার জন্য নন্দন আচার্যের গৃহে উপস্থিত হলেন।

সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে নন্দন আচার্য ভবনে গিয়ে কোটি সূর্যসম কান্তি নিত্য আনন্দে পূর্ণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করে তাঁকে প্রণাম করে ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, 'ওহে বান্ধবগণ! ইনি নিত্যানন্দ নামক অবধূত। বহুতীর্থ ভ্রমণ করে ইনি অশেষ পুণ্য অর্জন করেছেন। কলিপাপহারী শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম কীর্তন করার অভিলাষে ইনি তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছেন। অতএব এঁর যাতে সুখ হয় সে রূপ বিধান কর।' এই বলে কীর্তন সহযোগে নিত্যানন্দ প্রভুকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

নিত্যানন্দ প্রভু আসার পরই মহাপ্রভু নাম সংকীর্তন প্রচার শুরু করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সব সময়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে আলোচনা করতেন, কিভাবে এই কলিযুগের পতিতদের উদ্ধার করা যায়। আর নিত্যানন্দ প্রভু সেই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য সব সময় একটি লাঠি হাতে করে থাকতেন যাতে কলির প্রভাব ধ্বংস করতে পারেন। নিত্যানন্দ প্রভু দ্বারে দ্বারে যেতেন আর অনুরোধ করতেন, হরিনাম করো, তাহলে আমি দায়িত্ব নেব যাতে তুমি এই জড় জগতের সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পার। এই রকম বলতে বলতে তাঁর বাহু যুগল উত্তোলন করে যেতেন —

যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ, ভজ গৌরহরি।।

তুমি যদি গৌরহরির ভজনা কর তা হলে আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে যাবো। কি অপূর্ব ধরনের শর্ত তিনি দিয়েছেন — ভগবান নিজে বলেছেন, তিনি আমাদের ক্রীতদাস হয়ে যাবেন শুধুমাত্র যদি আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম উচ্চারণ করি, মহামন্ত্র কীর্তন করি। এই বলে নিত্যানন্দ প্রভু ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন আর লোকেরা লজ্জা পেয়ে বলতেন — আমি গৌরহরির নাম বলছি, আপনি উঠে পড়ুন। নিত্যানন্দ প্রভু এই ধরনের কৃপালু ছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গুণ কীর্তন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'যাঁরা নিত্যানন্দ প্রভুকে সমাদর করেন তাঁদের দারিদ্র থাকে না। যাঁরা নিত্যানন্দ প্রভুকে সমাদর করেন, তাঁদের গৃহের কুকুর-বিড়াল পর্যন্ত ভক্ত হয়ে যায়। যাঁরা নিত্যানন্দ প্রভুকে সমাদর করেন, তাঁরা আমার বিশেষ করুণা দৃষ্টি লাভ করেন।' এই উক্তির প্রমাণ স্বরূপ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ আছে, যখন দ্বিতীয়বার মাধাই মারতে যাচ্ছে তখন জগাই বাধা দিল — এই কথা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমুখপদ্ম হতে শ্রবণ করা মাত্রই 'জগাই রাখিল — হেন বচন শুনিয়া। জগাইরে আলিঙ্গিয়া — প্রভু সুখী হৈয়া।' মহাপ্রভু জগাইকে আলিঙ্গন করে বর প্রার্থনা করতে বললেন।

শ্রীল প্রভুপাদ একসময় লস এ্যাঞ্জেলসে প্রবচন প্রদান কালে বলেছিলেন, 'শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার জন্য চাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা এবং শ্রীচৈতন্যের কৃপা লাভের জন্য চাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা। আর নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করতে হলে আপনাকে জগাই-মাধাইয়ের মতো কলিযুগের পাপিষ্ঠ লোকেদের কাছে যেতে হবে। এই ধরনের লোকেদের কাছে গিয়ে তাদেরকে পবিত্র হরিনাম প্রদানের চেষ্টা করতে হবে, তাদেরকে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করাতে হবে। তাহলে নিত্যানন্দ প্রভু আমাদের সহজে কৃপা করবেন।'

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। এই বৎসর শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

একচক্রার পুণ্যতীর্থে নিত্যানন্দ রায়

যুগ-যুগান্তরের পৌরাণিক ইতিহাসের স্মারক একচক্রা ধাম। এই ধাম দেব-দেবতা এবং মুনি-ঋষিদের তপস্যার স্থল। কত শত সাধকের সাধনায় সিদ্ধ এই ধাম তা বলে শেষ করা যাবে না। এই ধাম হচ্ছে সেই অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামের একটি অংশ যেখানে স্বয়ং ভগবান বঙ্কিম রায় রূপে নিত্য বিরাজমান। এই পূত-পবিত্র তীর্থে স্বয়ং যুধিষ্ঠির মহারাজ এসে ধ্যান করেছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস কালে মা কুন্তীদেবী সহ ভীম, অর্জুনের মতো মহাপরাক্রমশালীরাও এখানে এসে অবস্থান করেছিলেন।

ভক্তিরত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে বর্ণনা আছে-

পাণ্ডবের কীর্তি যত বিদিত পুরাণে।
অসুর-রাক্ষস নাশ কৈল স্থানে স্থানে।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌড়দেশে প্রবেশিল।
রাঢ়ে একচক্রা নাম গ্রামে স্থিতি কৈল।।

পঞ্চপাণ্ডবের পদাভিষিক্ত একচক্রাধাম স্বয়ং ভগবান বলরাম-কৃষ্ণের নিত্য লীলাস্থলী। এখানেই ১২ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, ১৩৯৫ শকে মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর দুপুরে পিতা হাড়াই পণ্ডিত এবং মাতা পদ্মাবতী দেবীর কোল আলোকিত করে এই ধরা ধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অখিল ত্রাতা ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু। জগতের জীবকে তিনি উদ্ভাসিত করেছিলেন প্রেমানন্দে।

শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে-

"ব্রজে বলরাম যেই, সেই নিত্যানন্দ।
অবতীর্ণ হৈলা বিতরিতে প্রেমানন্দ।।"

নিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভূত হয়ে এখানে অনেক লীলা সম্পাদন করেছিলেন। কখনো তিনি অযোধ্যা লীলা, কখনো আবার বৃন্দাবন লীলা, কখনো নীলাচল লীলা। এই দিব্য লীলার মাধ্যমে তিনি সখ্য প্রেমের দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন। তাঁর সেই লীলাস্থলীগুলো এখনও বিদ্যমান। প্রতিদিন প্রায় হাজারো ভক্তের পাদচারণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে এই নিত্যানন্দ ধাম।

এখানকার বিশেষ দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে নিত্যানন্দ প্রভুর সেই সূতিকা মন্দির — যেখানে নিত্যানন্দ

প্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন। শোনা যায় নিত্যানন্দ প্রভু গর্ভাবস্থান কালে এক মুনিবর এখানে এসে দু'হাত তুলে আনন্দে নৃত্য করতে থাকেন এবং 'এখানে গর্ভাবাস' বলে নিত্যানন্দ প্রভুর শুভ আবির্ভাব স্থানকে নির্দিষ্ট করেন যা এখনও কালের সাক্ষী হয়ে আছে। তার পাশেই রয়েছে নিত্যানন্দ কুণ্ড, ষষ্ঠীতলা, বিশ্বরূপতলা, চন্দন সরোবর, পদ্ম পুষ্করিণী, সিদ্ধবকুল বা নাড়ীপোঁতা, শ্রীএকচক্রেশ্বর মহাদেব মন্দির, গোষ্ঠ তলা, রাসস্থলী (রথতলা), লক্ষ্মণ গড়িয়া, পাণ্ডবতলা, জানুকুণ্ড বা হাঁটুগাড়া, শ্রীমৌড়েশ্বর শিব, কুন্ডল তলা, শ্রীমদনেশ্বর শিব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই হাঁটুগাড়ার অনেক কীর্তিকথা এখানকার ধামবাসীদেরও কাছে গৌরবগাঁথা হয়ে আছে। একবার হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী দেবী তীর্থ

ভ্রমণ করতে চাইলে নিত্যানন্দ প্রভু এই জানুকুণ্ডে আসেন এবং তিনি তাঁর অনন্ত শক্তির আবেশে সমগ্র তীর্থকে আহ্বান করেন এবং সব তীর্থের জলে এ কুণ্ড পরিপূর্ণ হয়, আর সেই জলে তাঁর পিতা-মাতা তীর্থ স্নান করেন।

এছাড়াও এখানে আরো যে সকল দর্শনীয় তীর্থ স্থানগুলি আছে তন্মধ্যে — রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, কদম্বখণ্ডী ঘাট, রথতলা, গোষ্ঠতলা, জগন্নাথ মন্দির, যমুনা নদী, যমুনা তটস্থ ইসকন মন্দির এবং শ্রীবাঁকারায় মন্দির প্রসিদ্ধ। তাছাড়া এই বাঁকারায় মন্দিরেই নিত্যানন্দ প্রভু

অন্তর্ধান লীলা করেন। পরবর্তীতে জাহ্নবা মাতা এবং বীরচন্দ্র প্রভু এই স্থানে আগমন করেন। কলিযুগের পাবনাবতারী মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থলী এখনো এখানে দৃশ্যমান। যাদের হৃদয়ে শুধুমাত্র নিতাই-চৈতন্যচন্দ্রের করুণা প্রকাশিত হয়েছে তারাই

এখানে আসার অভিলাষী। ইসকন একচক্রা চন্দ্রোদয় মন্দিরের সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ, এবং অপূর্ব সুন্দর শ্রীবিগ্রহ - 'শ্রীশ্রীরাধা বৃন্দাবন মোহন এবং নিতাই-গৌরসুন্দর' সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে। তীর্থযাত্রী ভক্তদের জন্য ইসকন একচক্রা চন্দ্রোদয় মন্দিরে থাকার আবাসন এবং রাজভোগসহ

তিন বেলা প্রসাদের সুব্যবস্থা আছে। সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

(এখানে যাঁরা আসতে চান তাঁদের জন্য রইল আসবার ঠিকানা — কোলকাতা থেকে ট্রেনে রামপুরহাট অথবা সাঁইথিয়া নেমে বাস, অটো, ট্রেকার যোগে বীরচন্দ্রপুর নামক স্থানে নামলেই - ইসকন একচক্রা চন্দ্রোদয় মন্দির। (পোঃ- বীরচন্দ্রপুর, থানা- মোল্লারপুর, জেলা- বীরভূম। মোবাইল — ৯৫৬৪৩৭৯০৪৫ / ৮৯০৬৫৬৪২০৭ / ৯৮৫১৮৯৩৮৯৪)

ভ ক্তি ক বি তা

মর্ত্যের মানবে দেখো

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী

মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
সুস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি।।

মর্ত্যের মানবে দেখো
মৃত্যু সর্প হতে ভীত
চাহে অন্য পানে পলাইতে।
নাই তো ভরসা কোনো
সুস্থভাবে বাঁচিবারে
নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত চিতে।।

যদি হয় তার প্রতি
মহতের কৃপা দৃষ্টি
জীবনেতে কোনো একদিনে।
সেই দিন হৈতে হরি
সে হয় শরণাগত
তোমার অভয় শ্রীচরণে।।
সুস্থ চিতে তবে জানি
থাকিবে সে সেবানন্দে
পবিত্র সুন্দর প্রাণ তার।
যমদূত দূরীভূত
বিষ্ণুদূত অধিকৃত
হবে সে যে ভবদশা পার।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের বাংলাদেশ পরিদর্শন

১৪ই নভেম্বর থেকে ২০শে নভেম্বর, শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ বাংলাদেশের ইসকন সিলেট মন্দির পরিভ্রমণ করেন। মহারাজ দীর্ঘ নয় বৎসর পর সিলেট পরিদর্শনে গেছেন। তিনি শেষ বার ২০০৮ সালে গিয়েছিলেন।

ভক্তরা বিমানবন্দরে মহারাজের জন্য এক অতি আড়ম্বরপূর্ণ অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। হাজার হাজার ভক্ত বিমানবন্দরে জমায়েত হন মহারাজকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। মহারাজকে পুলিশ ভ্যান এবং শতাধিক ভক্ত মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা সহযোগে বিমানবন্দর থেকে বাসস্থান পর্যন্ত নিয়ে আসেন।

মহারাজ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দুইদিন ব্যাপী নামহট্ট সম্মেলন, সিলেট ইসকনের নব মন্দির নির্মাণের শিলান্যাস এবং দীক্ষা অনুষ্ঠান।

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে কৃপা প্রদান করার জন্য এখানে এসেছিলেন। পঞ্চতত্ত্বের পাঁচ জনের মধ্যে তিন জনই এই শ্রীহট্টে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই এখানে ভগবান শ্রীচৈতন্যের জন্য মন্দির নির্মাণ উপযুক্ত স্থান। আমি আশা করি, শ্রীহট্টের প্রত্যেক বিশেষ ব্যক্তি ভগবান শ্রীচৈতন্যের মন্দির নির্মাণ কল্পে সাহায্যের এই সুযোগ গ্রহণ করবেন।'

নামহট্ট সম্মেলনে যোগদানকারী সিলেট এবং অন্যান্য জেলার ভক্তদের উদ্দেশ্যে মহারাজ ব্যাখ্যা করেন যে, কিভাবে ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ থেকে দ্রুত ফল দেয় এবং ভক্তিযোগ কিভাবে অনায়াসে অভ্যাস করা যায় নামহট্ট প্রয়াসের মাধ্যমে। মহারাজ ভক্তদের উদ্দেশ্যে আবেদন করেন ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গরিমাকে বৃহত্তর পরিসরে প্রচার করার জন্য।

আরও অনেক বরিষ্ঠ মহারাজ যেমন ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ, গৌরাঙ্গপ্রেম স্বামী মহারাজ, ভক্তিপ্রেম স্বামী মহারাজ, ভক্তিপ্রিয়ম গদাধর গোস্বামী মহারাজ, নাড়ুগোপাল প্রভু ভক্তদের উৎসাহিত করার জন্য উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে সিলেট এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে প্রায় দশ হাজার ভক্ত অংশগ্রহণ করেছিল। স্থানীয় ভক্তরা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভক্তদের জন্য সিলেটে পাঁচশত ঘরের বন্দোবস্ত করেছিল। তিনদিন অবস্থানকালে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ আড়াই হাজারেরও বেশী ভক্তদের হরিনাম দীক্ষা প্রদান করেন।

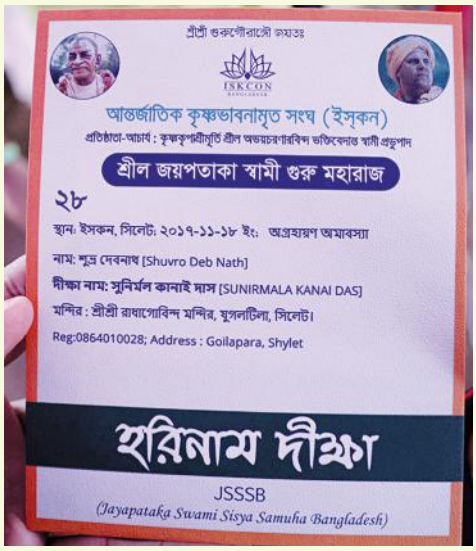

২০শে নভেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সেন্ট্রাল অর্গানাইজিং সেক্রেটারী জনাব মেসবাহউদ্দীন সিরাজ প্যাণ্ডেলে আসেন এবং মহারাজের গরিমা বর্ধনে বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্বতোভাবে ভক্তরা শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ও অন্যান্য বরিষ্ঠ ভক্তদের সান্নিধ্য উপভোগ করেন এবং ভগবদ্ কথা শ্রবণে সীমাহীন আনন্দ লাভ করেন।